গোকুলে গোপী

নটরাজন

সমকাল প্রকাশনী
১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলি-৬

GOKULE GOPA

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৬০

প্রকাশক :

প্রসূন কুমার বসু

সমকাল প্রকাশনী

১এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট :

অলোকশংকর মৈত্র

মুদ্রাকর :

মানসী প্রেস

৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০০৬

গোকুলে গোপা

১

—দিদি শোন শোন কি মিষ্টি বাঁশির সুর।

—সত্যিই তো! ছোট বোনের কথায় গোপা সচেতন হয়। কান পেতে শোনে কাছেই কোথাও কে যেন বাঁশি বাজাচ্ছে।

আর কিছু দূর চলার পর তারা বোসেদের পুকুর পাড়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। এখানে তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না, তাহলে বাঁশি বাজল কোথায়? গোপার দৃঢ় বিশ্বাস এই পুকুরের পাড থেকেই সে বাঁশির আওয়াজ পেয়েছে, মন্দ ব্যাপার নয় তো!

এই সময় শিবানী জিজ্ঞাসা করে আমরা কোথায় এসেছি রে দিদি?

—তুই জানিস নে? এ হ'ল বোসেদের পুকুর!

—ও মা তাহলে ভূত! তুই শীগিগর বাড়ী চল দিদি, আমি শুনেছি এখানে ভূত আছে। শিবানী গোপাকে জড়িয়ে ধরল।

একথা গোপাও শুনেছে। সে বোনকে সাহস দিয়ে বলল—দূর বোকা! ভূত কি কখনও দিনের বেলায় বের হয়? গোপা পুকুরের পাড় ধরে এগুতে চায়, কিন্তু শিবানী তার জামা ধরে পিছনে টানে। এমন সময় তাদের আশে পাশে কতকগুলো ডাঁসা পেয়ারা কোথা থেকে পড়ল। গোপার এবার সত্যিই গা ছম্‌ছম্‌ করছে, অথচ পেয়ারার লোভও সে দমন করতে পারছে না।

শিবানী বলে উঠল—দিদি তুই পেয়ারা ধরিসনে, ঠিক ভূতে ফেলেছে, চল দৌড়ে পালাই।

বোনের কথামত গোপা ছুট দেবে এমন সময় গাছের উপর থেকে ভেসে এ'ল—এই গোপা, এই শিবি, তোরা পালাস নে, তোদের কোন ভয় নেই, আমি গোকুল! সে লাফ দিয়ে নেমে দুইবোনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখে দুইবোনের ধড়ে প্রাণ এ'ল। তারা তিনজনে গিয়ে পুকুরের সান বাঁধানো ঘাটে বসে ডাঁসা পেয়ারাগুলো কামড়ে কামড়ে খেতে লাগল। তাদের মজা তখন দেখে কে!

গোপা পুকুরের জলে পা ডুবিয়ে টোপা পানা সরাতে সরাতে বলল। তুই একা একা এখানে আসিস তোর ভয় করে না? লোকে যে বলে এখানে ভূত আছে!

গোকুল বুক ফুলিয়ে বলল—আমি কি তোদের মত ভীতু যে ভয় পাব? আমি তো কতই আসি, কই ভূত-টুত তো দেখতে পাইনে?

গোপা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল—তুই বুঝি বাঁশি বাজাচ্ছিলি?

—হ্যাঁরে, বিশ্বেস হচ্ছেনা বুঝি? আমি ওপাড়ার যুগোল কাকার কাছে শিখছি, তুই তা জানিস নে?

—কি করে জানবো বল, তুই কি বলেছিস?

গোকুল লজ্জিত হ'ল। বলল এখন তো জানলি?

গোপা বলল হ্যাঁ—তা জানলাম, তুই আমাদের বাড়ীতে যাবি? আমরা সকলে তোর বাঁশি বাজানো শুনব!

—অন্য লোকের সামনে তো আমি বাজাতে পারব নারে, আমি তো এখনো ভালো শিখিনি…

গোপা হেসে বলল—আমাদের লিচু গাছে উঠে চুপি চুপি বাজাবি কেমন? কেউ তোকে দেখতে পাবে না।

—তা হলে যেতে পারি। কাল ইস্কুল থেকে ফিরে বিকালের দিকে যাব বুঝলি?

—আচ্ছা, আসিস কিন্তু, ভুলে যাসনে যেন! গোপা আর শিবানী ঘাটের সিঁড়ি থেকে উঠে বাড়ীর পথ ধরল।

পরের দিন বিকাল হতেই গোকুল বাঁশি বোগলে করে গোপাদের বাড়ীতে চলেছে। লোকে তার বাঁশি শুনবে? মনে তার আনন্দ ধরে না। যুগোল কাকার মত সে একদিন নাম করা বাঁশি বাদক হবে, গ্রামের যাত্রাদলে সেও তখন বাঁশি বাজিয়ে সকলের প্রসংসা অর্জন করবে!

দূরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে গোপা বলল—ওই দেখ মা গোকুল ঠিকই আসছে…তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

গৌরী তাকিয়ে দেখলেন হাফ প্যাণ্ট পরা একটা এগারো-বারো বছরের ছেলে তাঁদের বাড়ীর দিকে আসছে। তিনি তাড়াতাড়ি বারান্দায় ছোট মাদুর বিছিয়ে গোকুলকে বসতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা তুমি বুঝি গোপার সঙ্গে পড?

—না আমি ওর দুই কিলাস উপরে পড়ি।

—ওহ্ আচ্ছা! তুমি বাবা কোন বাড়ীর ছেলে?

—আমি দত্ত বাড়ীর ছেলে। আমার বাবার নাম শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর দত্ত।

আমার ঠাকুরদার নাম শ্রী শ্রী না—না ঈশ্বর তারকেশ্বর দত্ত। আমার ঠাকুরদার বাবার না—ম এই রে ভুলে গেছি। গোকুল জিভ্ কাটল।

গৌরী হেসে ফেলে বললেন—থাক্ থাক তোমাকে আর কষ্ট করে সাত পুরুষের নাম বলতে হবে না। তুমি ওদের সঙ্গে কথা বল, আমি এক্ষুণি ওঘর থেকে আসছি। মিনিট তিন চার পরে বড কাঁসার বাটিতে চিঁড়ে, মুড়ি, মুড়কি, দুধ, বাতাসা সবরী কলা ইত্যাদি এনে গোকুলের সামনে ধরে দিয়ে তিনি বললেন এইগুলো আগে খাও তারপর গল্প ক'র, কেমন?

গোকুল বলে উঠল—আমি তো খেতে পারব না। এই মাত্তর বাড়ী থেকে খেয়ে আসলাম।

গৌরী বললেন—না বাবা এই অল্প কটা জলখাবার তোমাকে খেতেই হবে। আমি তোমার জন্য তিলির নাড়ু বানিয়ে রেখেছি।

গোকুলের আপত্তি শেষ পর্যন্ত টিকল না। গৌরী দেবী তাকে খাইয়ে তবে ছাড়লেন। গোকুল এবার বাড়ীর পিছন দিকে গিয়ে বাগানের লিচু গাছের তলায় কাটা কাঁঠাল গাছের গুড়ির উপর বসে বাঁশিতে ফুঁ দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে তন্ময় হয়ে সুর সাগরে ডুবে গেল। তার বাজানোই কিছু ভুল ত্রুটী থাকলেও উপস্থিত শ্রোতা সকল নিবিষ্ট মনে কান পেতে রইল। যখন বাঁশি থামল তখন সন্ধ্যা আগত। চারিদিকে শাঁখ বেজে উঠেছে। গোকুল খুশি মনে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ীর পথে হাঁটা দিল। এরপর প্রায়ই সে গোপাদের বাড়ীতে এসে কখনও লিচু গাছে, কখনও বা কামরাঙ্গা গাছে উঠে বাঁশির সুর ভাঁজে। কখনও গোপা আর শিবানীর সঙ্গে খেলায় অংশ নেয়। গোপা আর শিবানীও গোকুলদের বাড়ীতে গিয়ে খেলা ধুলায় সময় কাটিয়ে আসে।

২

দেখতে দেখতে আশ্বিন মাস এসে গেল। দিন পনেরর মধ্যেই দুর্গা পূজা। গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে সাজো সাজো রব পড়ে গেছে। নতুন জামা কাপড কেনার ধুম। কারোর কয়েক দফা হল। কারোর বা নিতান্ত পক্ষে যেটা না হলে নয় তাই হল। সকলেই পূজার আনন্দে বিভোর। গ্রামের মধ্যে দু'খানা পূজা বড় কম কথা নয়। একখানা গ্রামের জমিদার মজুমদার বাবুদের বাড়ীতে, অন্যখানা পাল পাড়ায়। একখানা পূজা জাঁকজমকে অদ্বিতীয়া, অন্য

খানা প্রতিমার গঠন বৈচিত্রে অসামান্যা। এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতি বছরই হয়ে থাকে।

অষ্টমী পূজার দিন দুপুর বেলা গোকুল এলে গোপা তাকে জিজ্ঞেস করল—তুই ঠিক করে শুনেছিস তো বাবুদের বাড়ীতে আজ কোন পালা হবে ?

—শুনেছি, শুনেছি, আজ রাম যাত্রা হবে, তুই যাবি তো ?

—যাব আবার না ? আমি তো প্রতি বছরই যাই, গীতা দিদির সাথে যেতাম, সে তো এখন শশুর বাড়ী, এখন বাপের বাড়ী আসবে না নাকি, এবার আমি তোর সাথে যাব, নিয়ে যাবি তো ?

গোকুল বলল—তুই রাত জাগতে পারলেই হ'ল, যুগোল কাকা বলেছে এস্টেজের পাশে বসিয়ে দেবে, কাছে বসলে যুদ্ধটা বেশ ভালোই দেখা যায় কি বলিস ?

—হ্যাঁ। গোপা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

তাদের কথোপকথন শুনে শিবানী নাকি স্বরে বলল-মাগো আমিও যাত্রা শুনতে যাব, হু হু।

গৌরী রাগান্বিত হয়ে বলে উঠলেন—তোমারা যাবে যাও, কিন্তু ঠাণ্ডালাগিয়ে অসুখ বাধাতে পারবে না তা বলে দিচ্ছি। যাবার সময় চাদর নিয়ে যাবে, মাথা ঢেকে বসবে, মাথায় যেন নীয়ের (শিশির) না লাগে।

সন্ধ্যা বেলা গোকুল এসে ডাক দিতেই গোপা আর শিবানী পথে বেরিয়ে এল। মজুমদার পাড়ায় ঢোকার মুখে তেঁতুল তলায় এখনও বর্ষার জল দাঁড়িয়ে আছে। মুসলমান পাড়ার জব্বার আর সিদ্দিক কলাগাছের ভেলায় করে মাথা পিছু দু'পয়সা নিয়ে জল পার করে দিচ্ছে। গোকুল, গোবিন্দ, জয়ন্ত সকলেই পকেট হাতড়ে দেখল কারো কাছেই পয়সা নেই। নিত্য জলে নেমে পরীক্ষা করে দেখল, জল হাঁটুর কিছু উপরে, হেঁটে পার হওয়া যায়। তখন গোকুলের কাঁধে গোপা আর গোবিন্দের কাঁধে শিবানী চড়ে সকলে জলা পার হয়ে এ'ল।

পূজা মণ্ডপের সামনেই বড় সামিয়ানা খাটিয়ে যাত্রার আসর বানানো হয়েছে। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। সাজঘরে সাজগোছ চলছে কিছুক্ষণ পরে শুনতে পাওয়া গেল সীতা আসেনি। যে সীতার পার্ট করে সে হাটে গিয়েছিল বাতাসা-কদমা বিক্রী করতে, সেখান থেকে এখনো

ফিরে আসেনি। রাম আর লক্ষ্মণ অর্ধেক সাজ করে সাজঘরের সামনে রাস্তার দিকে পায়চারি করছে।

আরও ঘণ্টাখানেক কাটলে যখন লোকজন নিতান্তই অধৈর্য্য হয়ে পড়েছে তখন তারা শুনতে পেল "আসে গেছে, আসে গেছে" অর্থাৎ সীতা হাট থেকে ফিরে এসেছে। আরও আধঘণ্টা-চল্লিশ মিনিট মত বাদে আসরে একে একে আসতে থাকল, ডুগি-তবলা, হারমণিয়াম, ফ্লুট' আড়বাঁশি, বেহালা ইত্যাদি। রাজা রাণীর জন্য এল চেয়ার রূপী সিংহাসন। কিছুক্ষণের মধ্যে কনসার্ট বেজে উঠল। সখীরা এসে গান ধরল :—

রাম আমাদের হবে রাজা
সীতা হবে রাণী।
রোজ প্রভাতে উঠবে হেসে
নব রাগে দিনমণি ।।
রাম·········রাণী।
প্রজা সকল রবে সুখে,
রব মোরা হাসি মুখে-
রবেনা কারো অভাব কিছু
মনো দুখো গ্লানি ।।
রাম·············রাণী
আয় সখি তোরা সবে মিলে আয়,
আমরা বরণের ডালা সাজাই ;
বরণ করি তার চরণ দু'খানি ।।
রাম আমাদের······রাণী

রামকে বরণ করার জন্য সখীরা অতি যত্ন সহকারে নানা উপাচারে বরণ ডালা সাজিয়ে আনলেও তা কোন কাজেই লাগল না। দেখা গেল রাজা দশরথ সিংহাসনের উপর মুখ নিচু করে বসে আছেন, আর রাণী কৌশল্যা মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে কাঁদছেন। রাম অশ্রুসজল চোখে বলছে--

"দেহ মাত: বিদায় রামে চলিলা এবে বনবাসে, পিতৃসত্য পালনের তরে। চতুর্দশ বর্ষ কাটিবে নিমেষে মাত : থাকে যদি দোঁহার আশীর্বাদ এ শিরে।",

রাণী কৌশল্যা বহু কষ্টে ভূমি শয্যা ত্যাগ করে ধীরে ধীরে উঠে বসে বল্লেন-"নহে নহে রাম প্রাণাধিক পুত্র মোর, নাহি হও নয়ন অন্তরাল। কেমনে

সহি এ দুঃসহ বিচ্ছেদ বেদন এ বক্ষ মাঝে ?" তিনি বুক ধরে মাটিতে পড়ে গেলেন। আবার উঠে সীতার চিবুক স্পর্শ করে বললেন" নিষ্পাপ এ প্রতিমারে বিতাড়িয়া দূর বিজনে, নিরাপরাধে, পশিব রাজ অন্তঃ পুরে কেমনে ? কহ রাজন, রে বুদ্ধিভ্রষ্ট কামাসক্ত ক্ষত্রিয় কুলপতি! কেন কেন করিছ সর্বনাশ নিজেরে, এ অভাগীর নয়ন পুত্তলি নিক্ষেপিয়া গহীন সলিলে তুচ্ছ নারীর দুষ্টপণ রাখিবারে ?" তিনি মূর্ছা গেলেন।

রাম প্রণাম জানিয়ে চলতে শুরু করে বলল "মাতঃ—বৃথা ভৎর্সনা কর পিতারে মোর, ক্ষমিও তাঁরে, পিতা মোর নিরপরাধ, বিধির বিধান মাতঃ কেহ নাহি পারে খণ্ডিতে, ক্ষমিও রামে, আবার আসিব ফিরে তব ওই স্নেহ ক্রোড়ে মাতঃ চতুর্দশ বর্ষ পরে।"

রামের পিছু পিছু অশ্রুসিক্ত নেত্রে সীতা ও লক্ষ্মণ চোখের আড়াল হয়ে গেলে রাজা দশরথ সিংহাসন থেকে উঠে এসে বললেন—রাম, রাম ? ক্ষণিকের ভ্রমে এ কি কঠিন দণ্ড দিনু তোরে প্রাণাধিক পুত্র মোর! কেমনে সহি এ জ্বালা ? ফিরে আয় ওরে ফিরে আয়, বক্ষেতে মোর।" তিনি দুহাতে বুক চেপে ধরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

প্রথম দৃশ্যতেই গোপার চোখে জল এসে গেছে। সে মনে মনে ভাবল আজ না এলেই ভালো হত। তার চোখে জল দেখে শিবানী বলল—দিদি তুই কাঁদছিস কেন ? রাম তো আর সত্যি সত্যি বনে যায়নি, ওই দেখ্ ওখানে দাঁড়িয়ে সে কেমন বিড়ি টানছে!

---চুপ কর তুই, গাধা কোথাকার। কিছু বোঝেনা আবার যাত্রা শুনতে এসেছে! গোপা শিবানীর পিঠে এক চড় মারল।

গোপার চড় খেয়ে শিবানী কিছুক্ষন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে অবশেষে চুপ হয়ে গেল।

পরের দৃশ্য পঞ্চবটী বনে কুটীর বেঁধে রাম সীতা আর লক্ষ্মন বাস করছে। রাম বনে বনে ফল—মূল সংগ্রহ করে ফেরার সময় নানা রকম পুষ্প চয়ন করে আনে। সেগুলো দিয়ে সীতার নানা অঙ্গে সাজিয়ে দেয়। বড়ই মনোরম দৃশ্য গোপারও সাধ হয় ফুল দিয়ে সাজে। কিন্তু কে তাকে এমনি করে সাজিয়ে দেবে ?

চোখের সামনে একের পর এক দৃশ্য ঘটে চলেছে। লক্ষ্মণের হাতে সূর্পনখার নাক কাটা গেল। কুটীরের সামনে এসে সোনার হরিণ নাচ শুরু করে দিয়েছে

সীতার অনুরোধে রাম সেই হরিণকে ধরার জন্য তার পিছু নিয়েছে। লক্ষ্মণ কুটীর পাহারায় নিযুক্ত ছিল। হঠাৎ দূরে রামের আর্তস্বর শুনে যেই সীতা লক্ষ্মণকে সেই দিকে পাঠিয়েছে অমনি দুষ্ট রাবণ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরে এসে সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেল। তারপর একসময় হনুমান একলাফে সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় গেল। লেজের আগুনে সোনার লঙ্কা পুড়িয়ে ছারখার করল। অবশেষে রাম রাবণের যুদ্ধে রাবণ নিহত হলে সীতাকে উদ্ধার করে নিয়ে রাম অযোধ্যায় ফিরে এসে রাজা হল। এ সকল ঘটনা মন্থন করতে করতে ভোর রাত্রে গোপা বাড়ী ফিরে এসে পিসিমার মশারির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

পরদিন গোপা আবার যাত্রার আসরে উপস্থিত হয়েছে। আজ সে শিবানীকে সঙ্গে আনেনি। শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা শুনতে পাবেন আশা করে তার পিসিমা ব্রজবালা বাতের ব্যথা অগ্রাহ্য করে সঙ্গে এসেছেন আজ গোপাকে পিসিমার সাথে আসরের পূবদিকে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট ঘেরা জায়গায় বসতে হয়েছে।

রাজা কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছে। সেদিন বড় দুর্যোগ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে; ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। পিতা বসুদেব কৃষ্ণের প্রাণ রক্ষার জন্য গোকুলে নন্দ ঘোষের বাড়ীতে যাত্রা করেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় দ্বাররক্ষীরা সকলে দ্বার ছেড়ে গভীর ঘুমে অচেতন। বিনা বাধায় বসুদেব বাইরে এলেন। বিশাল এক অজগর (অনন্ত নাগ) এসে তার সহস্র ফনা বিস্তার করে শিশু কৃষ্ণের উপরে আচ্ছাদন দিয়ে নিয়ে চলেছে। বসুদেব যমুনার তীরে এসে থমকে দাড়ালেন, সামনে উত্তাল তরঙ্গিত ভয়াল যমুনা। ঘাটে কোন মাঝি নেই, পারাপারের নৌকা নেই, তিনি পার হবেন কি করে? ভয়ে ভাবনায় তিনি অবসন্ন হয়ে পড়ছেন। একি তার সামনে দিয়ে এক শৃগাল হেঁটে উত্তাল যমুনা পার হচ্ছে? তবে কি জল বেশি নেই? বাসুদেব শৃগালের দেখাদেখি সাহসে ভর করে যমুনায় নামলেন এবং পার হয়ে পরপারে এলেন, জল হাঁটুর উপরে উঠল না। তিনি নন্দ আলয়ে পৌঁছে দেখলেন সেখানেও দ্বার খোলা। ভিতরে ঘুমন্ত যশোদার কোলের কাছে ঘুমন্ত শিশু কন্যা। তিনি কৃষ্ণকে সেখানে রেখে যশোদার শিশু কন্যাকে নিয়ে নির্বিঘ্নে কারাগারে ফিরে এলেন…

…রাজা কংস শুনলেন ভগ্নী দেবকীর কন্যা হয়েছে। তাঁর জানা ছিল এবার দেবকীর গর্ভে যে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে তার হাতেই রাজার প্রান যাবে; কন্যার হাতে নয়। তবে তো আর তাঁর ভয়ের কারণ নেই। তবুও তিনি নিশ্চিত হতে পারেন না। কিসে কি হয় বলা যায় না। অতএব

নিষ্কণ্টক হওয়াই ভালো। রাজা ভাগ্নীকে আদর করতে গিয়ে তার 'পা ধরে পাথরের উপর আছাড মেরে হত্যা করতে চাইলেন। কিন্তু এ কি হল? শিশুতো মরল না। সে যে উপরে উঠে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে! আর কি যেন বলে গেল? "মূর্খ রাজা আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, তোর পাপের ভরা পূর্ণ হোক, তারপর তোর ব্যাবস্থা হচ্ছে, তোকে যে প্রানে বধ করবে সে ওদিকে গোকুলে বেড়ে উঠছে।" তবে তো অন্য উপায় দেখতে হয়! অতএব পুতনা রাক্ষসীর ডাক পডল। তাকে পাঠানো হল গোকুলে।

পুতনা সুন্দরী কৃষ্ণকে আদর করে কোলে তুলে নিল। নিজের দুধভরা স্তন বার বার কৃষ্ণের মুখে গুজে দিচ্ছে। কৃষ্ণ বারবারই মুখ সরিয়ে নিচ্ছে। অবশেষে সে দু হাতে ধরে মুখ দিয়ে এমন চোষন শুরু করল তখন পুতনা যন্ত্রনায় চিৎকার জুড়ে দিয়েছে, অবশেষে পুতনা প্রাণে মারা গেলে তবেই কৃষ্ণ শান্ত হল, পুতনা স্তনে বিষ পুরে এনে কৃষ্ণকে হত্যা করতে চেয়েছিল কিন্তু তা আর হ'ল না। তার পরিবর্তে নিজেকেই প্রাণ দিতে হল।

এর পরের কৃষ্ণ রাখাল বেশে বেণু হাতে করে মাঠে মাঠে ধেণু চরায়। ধেণুগণ বেণুর আজ্ঞা বহ হয়ে কখনও কাছে আসে, কখনও বা দূরে চলে যায়। এই বেণুর সুর অনুসরণ করেই তারা একে একে সন্ধ্যাবেলা বাডী ফিরে আসে।

কিশোর কৃষ্ণ যমুনার তীরে বাঁশি বাজিয়ে ঘুরে বেডায়। কখনও কদম গাছের ডালে বসে পা ঝুলিয়ে আপনমনে সুর ভাজে। সেই বাঁশির সুর শুনে রাধিকা সহ অন্যান্য গোপ বালারা যমুনার ধারে ছুটে আসে। তারা কৃষ্ণ ধ্যানে বিভোর হয়। কৃষ্ণপ্রেমে পুলকিত হয়। মন প্রান কৃষ্ণ পাদপদ্মে অর্পণ করে তারা সুখী হয়।

একদিন যমুনা পুলিনে রাধা সুগন্ধি কুসুম চয়ন করে এনে শ্রীকৃষ্ণের সারা অঙ্গে সাজিয়ে দিয়ে তার শ্রীচরণে অঞ্জলি দিয়ে পূজা করছে এমন সময় জটিলা ও কুটিলার সঙ্গে আয়ান ঘোষ সেখানে এসে হাজির হ'ল। রাধা তাদের দেখে প্রমাদ গুনলেন আশ্চর্য্যের বিষয় তখনই দেখা গেল রাধার সম্মুখে যিনি তিনি কৃষ্ণ নন, তিনি আয়ান ঘোষের আরাধ্যা দেবী কালী। একই আঙ্গে কৃষ্ণ ও কালী। অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণ, তিনিই কালী। ভক্তের মনোবাঞ্ছা অনুসারে নানা রূপে দেখা দিয়ে ঈশ্বর ভক্তকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন......

ফিরে আসার সময় গোপা নিজেকে রাধা কল্পনা করে। কিন্তু কাকে সে কৃষ্ণ রূপে পূজা করবে ভাবতে থাকে।

৩

কয়েকটা বছর পরের কথা গোপা গ্রামের জুনিয়র হাই স্কুলে এখন সপ্তম শ্রেনীতে পড়ে। পৃথিবীতে কোথায় কি পরিবর্তন হয়েছে সে অত ধার ধারেনা। শুধু সে অনুভব করে তার শরীরের কোথাও কোথও পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। মনের মধ্যে তার অনেক প্রশ্ন জাগে ; কিন্তু মুখে আটকে যায়। সে বোঝে মা তাকে আগের মত আর এখন যেখানে সেখানে একা যেতে দেননা। একটু চোখের আড়াল হলেই বকাবকি করেন। কিছুক্ষণ না দেখতে পেলে মা, পিসিমা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেন সে এতক্ষণ কোথায় ছিল, কার সঙ্গে কথা বলছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। আগে সে যখন তখন আদুল গা হতে পারত, কিন্তু এখন মা পিসিমা তো বকাবকি করেনই তার নিজের ও কেমন অস্বস্থি লাগে, এত লজ্জা তো তার আগে ছিল না? মাঝে মাঝে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে তার খুব দেখতে ইচ্ছা করে।

অনেকদিন হ'ল গোকুল এ বাড়ীতে আসে না। সে বৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করার পর তাকে তার মামারা তাদের গোপাল পুরের হাই স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। সে সেখানেই থাকে। গোপার ভারী ইচ্ছা হয় গোকুলকে একবার দেখে ; কিন্তু তার ইচ্ছার কথা সে কাউকে বলতে পারেনা।

আজ গোপাদের স্কুলে স্কুল পরিদর্শক এসেছিলেন। তিনি চলে গেলেই স্কুল ছুটি হয়ে গেল। ফেরার সময় সিকদাবদের বাড়ীর কেয়া জোর করে গোপাকে বাড়ীতে টেনে নিয়ে গেল। ফেরার পথে বোস পুকুরের কাছাকাছি আসতেই তার মনে হল পুকুরের পাড থেকে বকুল ফুল কুড়িয়ে নিয়ে গেলে হয়। আগে তারা দু'বোনে প্রায়ই এসে ফুল নিয়ে যেত। এখন মা তাকে আসতে দেন না। এদিকে বড কেউ একটা আসেনা। ভূতের প্রবাদটা অনেকেই বিশ্বাস করে। দূরে দূরে চাষীরা মাঠে ধান বোয়ার কাজে ব্যস্ত। ঘনো গাছ গাছালিতে ভরা পুকুরপাড তাদের দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়।

গোপা বকুল গাছের গোড়ায় বই খাতা নামিয়ে রেখে একমনে নিচু হয়ে ফুল কুডাচ্ছে এমন সময় কে যেন পিছনদিক থেকে এসে তার দুটো চোখ চেপে ধরল। যখন সে ছাড়া পেল তখন সে ভয়ে বিহ্বলে তাকিয়ে দেখল পায়জামা পরা স্যাণ্ডো গেঞ্জি গায়ে সবে গোঁফের রেখা ওঠা এক সুশ্রী কিশোর বাঁশি বোগলে করে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তারই দিকে চেয়ে আছে।

প্রথমে কারো মুখেই কথা নেই, পরে গোপা বলল—তুই, তু-তুমি এখানে? কবে বাড়ী এসেছ?

—কাল এসেছি, ভাবলাম পুরানো জায়গাটা একবার ঘুরে যাই, কিন্তু তুই কি মনে করে এলি?

স্কুল থেকে কেয়াদের বাড়ী গিয়েছিলাম। ফেরার পথে বকুল ফুল নেব বলে এসেছি। তুমি তো মামাবাড়ী ভালো স্কুলে পড়ে আমাদের কথা—আমার কথা একদম ভুলে গিয়েছ।

গোকুল লজ্জিত হয়। বলে ওঠে নারে বিশ্বাস কর ভুলিনি, তোর কথা কি ভুলতে পাবি? আসতে পারিনা তাই, মেজমামা আসতে দিতে চায়না।

গোপা আবার বলে ওঠে—তুমি সত্যিই আমাকে ভুলে গিয়েছ, না হলে এই ক'বছরের মধ্যে তোমার দেখা নেই এমনি?

—তোর গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি আমি তোকে ভুলিনি, ভুলিনি, ভুলিনি। গোকুল গোপার ডান হাত হাতখানা মুঠোর মধ্যে ধরে।

গোপার শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে যায়। সে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে। বুঝতে পারেনা এমনি হচ্ছে কেন।

গোকুল প্রশ্ন করে—কিরে তোর কি ভয় করছে?

গোপা মিষ্টি করে হেসে জবাব দেয়—কই না তো? দু'জন থাকলে আর ভয় কিসের?

গোপা এবার গোকুলের মুখোমুখি হয়ে তার দুটো হাত দু'হাতে ধরে বলল—আচ্ছা তোমার সেই কেষ্ট যাত্রার কথা মনে আছে?

'গোকুল ঘাড় নেড়ে জানায়—হু আছে, কেন বল তো?

—তুমি চুপ করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি বলছি।

—আচ্ছা এই দাঁড়ালাম, বল কি বলবি?

গোপা কয়েক মুঠো বকুল ফুল গোকুলের পায়ের উপর ছড়িয়ে দিয়ে বলল—তুমি আমার কেষ্ট ঠাকুর তাই তোমাকে পুজো করলাম।

এবার গোকুল বলল—বুঝলাম, তুই তাহলে এখানে বসে মালা গাঁথ, আমি এক্ষুনি আসছি। সে বাগান থেকে কিছু ফুল তুলে নিয়ে গিয়ে গোপার মাথায় গুঁজে দিয়ে বলল—মনে আছে তোর, পঞ্চবটী বনে রাম কেমন সীতাকে সাজিয়ে দিয়েছিল।

এই কথা শুনে গোপা বলে উঠল—এ মা! এ তুমি কি করলে?

গোকুল অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—কেন, কি করলাম?

—আমার মাথায় ফুল দিলে কেন? শ্রীকৃষ্ণ তো ভগবান ছিলেন, তাই রাধা তাকে পুজো করেছিল, আমি সেই জন্যই তোমাকে পুজো করলাম। আর সীতা তো রামের বৌছিল……গোপার কথা মুখে আটকে যায়। তারপর বলে—কিন্তু তুমি আমার ভগবান, আমার কেষ্ট ঠাকুর।

গোকুল বুঝে উঠতে পারেনা এখন কি বলা উচিৎ। সে ভেবে নিয়ে বলে—আচ্ছা বুঝেছি! আমি কেষ্ট ঠাকুর আর তুই রাধা কেমন তাই তো?

—হ্যাঁ আমি রাধা হতে পারি, গোপা খুশি হয়।

—তাহলে আমাকে ভালোকরে পুজো কর।

গোপা আবার অঞ্জলি ভরে গোকুলের পায়ের উপর ফুল গড়িয়ে দেয়। গাঁথা মালাটা গোকুলের গলায় পরিয়ে দেয়।

গোকুল আবার সেই মালাটা গোপার গলায় পরিয়ে দিয়ে বলে ওঠে—আজ থেকে আমি কেষ্টঠাকুর আর তুই আমার রাধা বুঝলি তো?

—হ্যাঁ বুঝেছি, গোপা মাথা নাড়ে।

—কিন্তু আমার বাঁশি কিংবা আমার কথা তোর কানে গেলে আমার কাছে ছুটে আসতে হবে, কি পারবি তো?

গোপা কিছু না বুঝেই বলে ওঠে—হু পারব!

গোকুল বাঁশিতে ফুঁ দেয়।

এমন সময় ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নেমে পড়ে। গোপা আর গোকুল ছুটে গিয়ে বকুল গাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার চেষ্টায় একে অপরের নিকটতম সান্নিধ্যে চলে আসে। গোপার মুখোলাবণ্য, কেশের গন্ধ গোকুলকে মোহাবিষ্ট করে রাখে, সে কথা বলতে ভুলে যায়। বৃষ্টি ছেড়ে গেলে গোপা বিদায় চাইলে তার সম্বিত ফিরে আসে। সে বলে বসে—কাল আবার এমন সময় এখানে আসবি তো?

—আসব, গোপা ইঙ্গিতবহ হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে দিয়ে বাড়ীর পথে পা বাড়ায়। গোকুল একবুক তৃষ্ণা নিয়ে সেই চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার সর্বশরীর মন কোন্ আবেশে যেন ভরে রয়েছে।

……পরেরদিন স্কুলে গিয়ে দুটো পিরিয়ড শেষ হতেই গোপার শরীর খারাপ হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে সে বারদুই পায়খানায় গেছে। অসুস্থতা জনিত ছুটি মঞ্জুর হতেই সে বইখাতা গুছিয়ে নিয়ে বাড়ীর পথ ধরল। বলা বাহুল্য বোস পুকুরের পাড়ে বকুলতলা গিয়ে তার যাত্রার বিরতি ঘটে। কিন্তু সেখানে

যার দেখা পাবার কথা ছিল সে তখনও এসে পৌছায়নি। গোপা গুনগুন করে গানের কলি ভাজতে ভাজতে মালা গাঁথা শুরু করল। ইতিমধ্যে ঘণ্টা-খানেক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এত দেরি তো হবার কথা নয়? তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে পড়ে, গোকুল তো স্কুলে যাবার ছেলে নয়। তবে কি বৃষ্টিতে ভিজে তার অসুখ-বিসুখ করল? গোপা হাত জোড করে প্রার্থনা জানায় হে কেষ্ট ঠাকুর দোহাই তোমার ওকে তুমি কোন জর-জারি দিয়োনা। সে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা' করে আশা ভঙ্গের ব্যথা নিয়ে বাড়ীতে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

পরের দিন ছুটি। দুপুর বেলা কাউকে কিছু না বলে গোপা একবার তাডাতাডি পুকুরপাড ঘুরে এ'ল। না, গোকুল আজও আসেনি।

খাওয়া দাওয়ার পর গোপা বোনকে ডেকে বলল—শিবি একটা কাজ করে দিবি? তোকে আমি তিলে খাঁজা খাওয়াব পয়সা দেব।

—হঁ্যা করে দেব, বল কি করতে হবে?

ও পাডায় গোকুলদের বাডীতে একবার যাবি? যদি সে বাডী এসে থাকে তাহলে তার ছবি আঁকার খাতাখানা চেয়ে আনবি। সে বাডি না থাকলে জেঠিমার কাছে বলবি, আমি খাতাখানা চেয়েছি। আমার স্কুলে ড্রইং-এর পরীক্ষা আছে, খাতাটা খুবই দরকার। রাস্তায় খাতা খুলিসনে যেন, বাডী এলে আমি তোকে সব ছবি দেখাব, বুঝলি তো।

আচ্ছা। শিবানী তিলেখাজা খাবার লোভে দিদির আজ্ঞা পালন করতে ছুট দিল এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে খাতাখানা এনে গোপার সামনে রেখে বলল—দিদি দে আমার তিলেখাজা খাওয়ার পয়সা।

গোপা বিছানার তলা থেকে একটা সিঁকি বের করে বোনের হাতে দিতে শিবানী মহা আনন্দে পয়সা নিয়ে কুণ্ডুপাডার দিকে ছুট দিল।

গোপা বেশ সতর্কতার সঙ্গে খাতার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় তার ইপ্সিত বস্তুটি পেয়ে গেল। একখানা মুখ আঁটা কাগজের ভেতরে ছোট্ট চিরকুট—

"আমি জানি তুই কাল ঠিক সময়ে এসেছিলি। কিন্তু আমি কথা রাখতে পারিনি। সেদিন বৃষ্টিতে ভিজে জর হয়েছে। সব সময় শুধু তোর মুখখানা আমার চোখের সামনে ভাসছে। জানিনা আবার কবে ভালো হয়ে তোকে দেখতে পাব।"

গোপার মন খারাপ হয়ে গেল। সে যা ভেবেছিল তাই-ই হয়েছে। কি করে একবার গোকুলকে দেখতে যাওয়া যায় সেই কথাই সে ভাবতে থাকে। একটু পরে শিবানী বাড়ীতে ঢুকলে গোপা জোরে জোরে উচ্চারণ করল-কার কাছ থেকে খাতা আনলি বললি না তো?

শিবানীর মুখের মধ্যে তিলেখাজা রয়েছে। সে কড়মড় করে চিবিয়ে ঢোক গিলে বলল—গোকুল দাদার কাছ থেকে এনেছি, সে বাড়ী এসেছে, তার জ্বর, ঘরে শুয়ে রয়েছে।

এবার গোপা মার কাছে গিয়ে বলল—শুনেছ মা গোকুলের জ্বর হয়েছে, তাকে একবার দেখতে যাব?

গৌরী দেবী একটু চিন্তা করলেন, তারপর বললেন—আচ্ছা যাও কিন্তু একা যেয়োনা, তোমার পিসিমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। তিনি দোকান থেকে এক পোয়া বিস্কুট কিনিয়ে আনালেন।

কিন্তু যাবার সময় গোল বাধল। গৌরী দেবী বাক্সে তোলা শাড়ী বের করে গোপাকে পরিয়ে দিচ্ছেন। গোপা শাড়ী পরতে রাজী নয়। তার মা বললেন—পর মা পর, অমন করতে নেই, তুমি এখন বড় হয়েছ; না হলে তোমার বাবার নামে যে নিন্দে হবে! অগত্যা গোপাকে শাড়ী পরেই পথে বেরুতে হল।

ব্রজবালাকে দেখে ননীবালা হেসে অভ্যর্থনা করলেন—আসেন দিদি আসেন। আমার কী সৌভাগ্য যে মা লক্ষ্মী স্বয়ং পায়ে হেঁটে আমার ঘরে আসছে।

গোপা লজ্জায় রাঙা হয়ে কোন মতে নিচু হয়ে ননীবালার পায়ের ধুলো নিল। ননীবালা তার চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদ করলেন। সকলকে মাদুর পেতে বসতে দিয়ে তিনি ব্রজবালার উদ্দেশ্যে বললেন—অপনার ভাই বৌ বড় ভাগ্য করে এমন প্রতিমার মত মেয়ে পেয়েছে। দিদি, ও যে ঘরে যাবে সেই ঘরই আলোয় ভরে উঠবে।

ব্রজবালা বললেন—সে তোমাদের পাঁচজনের আশীর্বাদ। শিবানীর মুখে শুনলাম গোকুলের জ্বর তাই দেখতে এলাম, সে কোথায়?

—ওই তো বড় ঘরে শুয়ে আছে।

সকলে বড় ঘরে এসে মেঝেয় মাদুরে বসল। গোকুলের তখন একটু তন্দ্রামত এসেছে। ব্রজবালা গিয়ে গোকুলের কপালে হাত রেখে অনুভব করলেন বেশ উত্তাপ রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কোন ডাক্তার দেখছে?

ননীবালা জবাবে বললেন—ফনী ডাক্তার। তিনি বলেছেন আজকের মধ্যে যদি জ্বর রেমিশন না হয় তাহলে টাইফয়েডে মোড় নিতে পারে। আপনারা একটু বসুন দিদি, আমি ও ঘরে যাই।

ননীবালা চলে গেলে তার কিছুক্ষন পর ব্রজবালা কিছু দরকারী কথা বলার জন্য রান্না ঘরে গেলেন। গোপা আর শিবানী মেঝেয় বসে রইল। টাইফয়েডের সম্ভাবনার কথা শুনে গোপার মন খারাপ হয়ে গেছে। সে বসে বসে ভাবছে। মনে মনে ঠাকুরের কাছে গোকুলের আরোগ্য কামনা করছে। চঞ্চল মেয়ে শিবানীর পক্ষে বেশিক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকা সম্ভব নয়। সে এক ফাঁকে উঠে গোকুলদের বাগানে করমচা খুঁজতে চলে গেল। বেচারী গোপা কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। তার মা তাকে কডা মাড় দেওয়া সন্য ভাজ ভাঙা শাড়ী পরিয়ে তাকে মুস্কিলে ফেলেছেন। একে তো শাড়ী পরে তাকে বয়সের তুলনায় বড দেখাচ্ছে, তার উপর খসখসে কাপডের জন্য সে স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরাও করতে পারছে না। গোকুলদের বড ঘর থেকে রান্না ঘর একটু দূরেই। শিবানীও ঘরে নেই। গোপা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে গোকুলের খাটের পাশে দাঁডাল। ডান হাতখানা বাডিয়ে গোকুলের কপালের উপর রাখতেই সে চোখ খুলে কিশোরী গোপার নারী সৌন্দর্য্যকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখল। হাত বাড়িয়ে তার ফুলের মত কোমল ডান হাতখানা টেনে নিয়ে নিজের বুকের উপর রেখে চেপে ধরল। গোপা জাগ্রত দুই দৃষ্টিকে পাহারায় নিযুক্ত রেখে নিজে কোন্ উপলব্ধির সাগরতলে ডুব দিল। তার চোখের কোল ভিজে উঠল। তারপর হাত ছাডিয়ে নিয়ে ফিরে এসে মেঝেয় মাদুরে বসার অব্যবহিত পরে কথা বলতে বলতে ব্রজবালা আর ননীবালা জলখাবারের থালা নিয়ে ভেতরে এলেন।

—

দিনচারেক পরে গোকুল সুস্থ হয়ে বিকালের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ফুটবল মাঠে খেলা দেখতে গেল। কিছুক্ষণ খেলা দেখে নদীর ধার ধরে এগিয়ে এক সময় গোপাদের বাড়ীতে এসে পৌছল। গোপা তখন বসে গরুর জন্য বিচালি কুচুচ্ছে। শিবাণী কলতলায় বিকালের এঁটো বাসন ধুচ্ছে।

গোপা হাতের কাজ ফেলে রেখে দৌড়ে এসে বারান্দায় মাদুর পেতে গোকুলকে বসতে দিয়ে বলল—জ্বর সেরেছে তো ?

—হ্যাঁ সেরেছে। গতকাল ভাত খেয়েছি।

---এই শরীর নিয়ে বেরিয়েছ কেন ? যদি আবার জর আসে।

—না আর জর আসবে না, বারবার কি জর আসে ?

---অসাবধান থাকলেই আসবে। গোপা গোকুলের মুখের দিকে তাকাল।

—বাড়ীটা ফাঁকা লাগছে যে, কাকীমা কোথায় ?

—মা আর পিসিমা পুঁটির হবু বর দেখতে গিয়েছে। গোপা একখানা ছোট রেকাবিতে খান কতক বাতাসা আর জলের গেলাস এনে গোকুলের পাশে রাখল।

—তুই দেখছি অন্তর্যামী। কখন থেকে আমার গলা শুকিয়ে রয়েছে। সে এক চুমুকে সবটুকু জল খেয়ে বলল আহ্—শান্তি হল।

গোপা গোকুলের ভাব দেখে হেসে ফেলল। শিবানীর দিকে তাকিয়ে বলল—শিবি বাছুর আনা হয়েছে রে ?

—নারে দিদি, এই আমি যাচ্ছি। শিবানী ছুটে বাছুর আনতে বাড়ীর বাইরে চলে গেল। গোপা দেখল গোকুল তাকে মুগ্ধ চোখে দেখছে। সে মুখ নিচু করে নিল। একটু চুপ করে থেকে বলল—একটা কথা বলব ?

—বল। গোকুল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

গোপা তবুও চুপ করে আছে দেখে গোকুল আবার বলল—কিরে কি হল, বলবি তো ?

গোপা অত্যান্ত সঙ্কুচিত হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে খুব আস্তে করে বলল একখানা বই এর মধ্যে আছে "ভালোবাসা" এই কথাটার মানে কি ?

—কোন বইতে লেখা আছে বলতো ?

—গীতা দিদি তার বিয়েতে একখানা বই উপহার পেয়েছিল, তার মধ্যে লেখা ছিল।

—আর কি কি কথা সেখানে লেখা ছিল ?

—সব কথা তো আমার মনে নেই, এই কথাগুলো শুধু আমার মনে রয়েছে। গোপা খাতায় পেন্সিল দিয়ে লিখে দেখাল "অনুরাধা মনে মনে বিজয়কে ভালো বাসিয়া তাহার সাক্ষাৎ পাইবার আশায় অতিশয় ব্যকুল হইয়া উঠিল। তাহার আহার নিদ্রা ঘুচিবার উপক্রম হইল।"

গোকুল বার কয়েক মনোযোগ সহকারে লেখাটা পড়ে নিয়ে বলল—মানে

তো ঠিক বলতে পারছি না, তবে আমার মনের মধ্যে যেমন করে এখানে তে া তাই-ই লিখেছে মনে হচ্ছে।

গোপা মাদুরের উপর বসে গোকুলের কাছে সরে এসে বলল—তোমার মনের মধ্যে কেমন করে বল তো ?

তোকে বেশিদিন না দেখতে পেলে আমার মনটাও যে তোর জন্য ওই রকম ছটফট করে রে।

গোপা হেসে ফেলল। বলল—দূর তোমার এসব বানানো মিথ্যে কথা!

গোকুল প্রতিবাদ করল—নারে সত্যি কথা, তোর এই গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি! সে হাত বাড়িয়ে গোপার হাত ধরল।

গোপা হাত না ছাড়িয়ে চোখ বন্ধ করে বলল—তোমাকে না দেখতে পেলে আমার মনটাও ঠিক ওইরকম করে। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, কপালে বিন্দু, বিন্দু ঘাম জমেছে। সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

এই সময় শিবানী বাছুর নিয়ে বাড়ী ঢুকে নাদায় বেঁধে রেখে বলল—গোকুল দাদা তুমি বাঁশি আননি কেন ?

—আনতে ভুলে গিয়েছি রে! আমাদের বাড়ী গিয়ে কাল শুনে আসিস কেমন ?

—তা হবে না, তোমাকে আমাদের বাড়ী এসে শোনাতে হবে।

—আচ্ছা তাই হবে। কাল বিকালে এসে শুনিয়ে যাব। সন্ধ্যা আগত দেখে গোকুল বাড়ী যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

গোপা উদাস দৃষ্টি মেলে গোকুলের চলে যাওয়া দেখল। চোখের আড়াল হলে সে ফিরে এসে তুলসীতলায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাল। ভক্তিভরে কেষ্টঠাকুরকে প্রণাম করল। তার মুদ্রিত চোখের সামনে কৃষ্ণরূপী গোকুলের মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে। গোপা মাথা নত করে তন্ময় হয়ে রইল।

এরপর একটা সপ্তাহ গোপার বড়ই উদ্বেগের মধ্যে কাটল। প্রতিদিন বিকালে তার মনে হয়েছে গোকুল আসবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আসেনি। শেষে গোপা ধরে নিয়েছে হয় সে মামাবাড়ী চলে গেছে, না হয় তো আবার অসুখে পড়েছে। শেষেরটাই তার বেশি করে মনে হল। তার মন ভয়ানক রকম খারাপ হয়ে উঠল। সে কৃষ্ণঠাকুরের কাছে গোকুলের আরোগ্য কামনা করে পুজোর মানত করল। কি করে তাকে দেখতে যাওয়া যায় সেই কথাই কেবলি ভাবতে লাগল।

পরেরদিন স্কুলে যাবার সময় শিবানী দৌড়ে এসে বলল—দিদি কাজলী হাত থেকে ছুটে মাঠের দিকে পালাল, এখন কি করি বলতো ?

কাজলী অর্থাৎ তাদের গরুর বাছুর। 'চল দেখি, বলে গোপা বই-খাতা নামিয়ে রেখে দুই বোনে বাছুর খুঁজতে বেরুল। গৌরী আর ব্রজবালাও পথে বেরুলেন। প্রায় ঘণ্টা খানেক খুঁজে হয়রান হয়ে সকলে বাড়ী চলে এল। না, বাছুরকে কোথাও পাওয়া গেলনা। গোপা আর শিবানীর স্কুলে যাওয়া হ'ল না। দুই বোনে একটু বিশ্রাম করে আবার খুঁজতে বের হ'ল। কিছুদূর গিয়ে তাদের নজরে পড়ল কাজলী বাড়ীর দিকে আসছে। হঠাৎ তার কি মতি হ'ল দুই বোনকে দেখতে পেয়ে আবার উল্টো দিকে দৌড় দিল। গোপা আর শিবানীও তার পিছনে দৌড়াল। কাজলী দৌড়াতে দৌড়াতে একেবারে বোস-পুকুরের পাড়ে গিয়ে থামল। শিবানী ছুটে ধরতে গেল কিন্তু ধরা সহজ হ'ল না। বাছুর পশ্চিম পাড়ের বেতের ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। শিবানী চেষ্টা করল বটে কিন্তু কাঁটার মধ্যে ঢুকতে পারল না। দুই বোনে অসহায় ভাবে ঝোপের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। সেই সময় গোকুল বাঁশি হাতে করে পুকুর পাড়ে আসছে। সে শুনতে পেল পশ্চিম পাড়ে কারা যেন জঙ্গলের মধ্যে কথা বলছে। সে হেঁকে বলল—কে রে ঝোপের মধ্যে ?

—শিবানী সাড়া দিল—আমরা গোকুল দাদা, দেখনা আমাদের কাজলী এসে এখানে ঢুকেছে, বের হচ্ছেনা।

গোকুল এগিয়ে গিয়ে কাজলীকে দেখতে পেল, সে বেতের ঝোপের মধ্যে আটকে পড়েছে।

গোকুল দড়ি চাইতেই গোপা জিভ কেটে বলল—এই যা ভুলে বাড়ীতে রেখে এসেছি যে! যা তো শিবি দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আয়।

শিবানী দড়ি আনতে বাড়ী চলে গেল। গোকুল বনআলুর লতা ছিঁড়ে হাতে নিয়ে বেশ কায়দা করে ঝোপের মধ্যে ঢুকল। আগে বাছুরের গলায় বাঁধল, তারপর তাকে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে বাইরে এসে খেঁজুর গাছের গোড়ায় বেঁধে রাখল। পাশেই ঘাসের উপর গোপা আর গোকুল বসল। এবার গোপা বলল—আবার অসুখ করেছিল তো ?

গোকুল উত্তরে বলল—না ভালো ছিলাম, তবে বাড়ী থেকে বড় একটা বেরুই নি।

—তাহলে এই ক'দিন দেখা নেই কেন ?

—বললাম যে বাড়ী থেকে বের হতে পারিনি। বড়মামার ছেলে এসেছিল, তাকে নিয়ে ইচ্ছে করেই তোদের বাড়ী যাইনি।

গোপা বলল—আজ এখানে এইভাবে দেখা না হলে তোমার দেখা পাওয়া যেত না কি বল ?

গোকুল বলল—আজ বিকালে যাব ঠিক করেছিলাম ।

গোপা বলল—তোমার যত সব মিছে কথা।

—নারে সত্যি কথা।

গোপা একটু চুপ করে থেকে বলল—আমার সেই কথাটার মানে খুঁজে পেয়েছ ?

—পেয়েছি। গোকুল গোপার চোখে চোখ রাখে।

—তাহলে বল মানেটা কী ?

—এখন বলব না।

—কখন বলবে ?

—বড় হ, সময় হলেই বলব।

গোপা আঙুল তুলে একটু দূরে দেখিয়ে বলল—ওই দেখ সেদিনকার মালাটা ওখানে পড়ে রয়েছে।

গোকুল সেটা কুড়িয়ে এনে পকেটে রাখল।

গোপা বলল—ওটা পকেটে রাখলে কেন ?

—কাজে লাগবে বলে।

—কী কাজে ?

—যখন লাগবে তখন জানা যাবে, এখন নয়। কাল আমি চলে যাচ্ছি, আবার ছয়মাস পরে আসব।

—বাবাঃ এতদিন পরে ? গোপা নিচু হয়ে গোকুলের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

গোকুল বলে উঠল—একি ? আমাকে প্রনাম করলি যে ?

গোপা মুখ টিপে হেসে বলল—তোমাকে করিনি তো !

—তবে কাকে করলি ?

—যে বাঁশি হাতে ধেনু চরায়।

গোকুলের হাতে ধরা বাঁশি আছে পাশে রয়েছে কাজলী। সে বলল "আমিই তো।"

গোপা হেসে বলে—না, সে আমার কেষ্ট ঠাকুর।

গোপার হেয়ালিপূর্ণ কথার কোন জবাব না দিতে পেরে গোকুল চুপ করে থাকে।

এই সময় শিবানী দড়ি হাতে করে ফিরে এল। গোকুল তাদের সঙ্গে গোপাদের বাড়ী পর্যন্ত গিয়ে কাজলীকে পৌছে দিয়ে বাড়ী ফিরে গেল।

৪

কিছুদিন হ'ল আশে পাশে নানা ধরনের গোলমালের খবর পাওয়া যাচ্ছে! দেশ বিভাগের প্রাক্কালে যা গণ্ডগোল হয়েছিল তারপর আবার সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা সম্প্রীতিতে বসবাস করছিল। কিন্তু সম্প্রতি আবার সেই নোংরা ব্যাপারগুলো ঘটতে শুরু করেছে। হিন্দু অবিবাহিত তরুণী কিংবা কিশোরীরাই শুধু অত্যাচারের শিকার নয়, বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিবাহিত হিন্দুরমনীকেও অপহরণ করে নিয়ে অহিন্দু পরিবারের বউ হতে বাধ্য করা হয়েছে। যেদিন কুণ্ডু পাড়ার ঘাট থেকে অন্তঃসত্বা ডলিকে ওপারের লোকেরা ধরে নিয়ে গেল সেদিন গোপাদের গ্রামের হিন্দুদেরকে গ্রাম ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে হল।

ধর্মীয় কাঠামোতে হিন্দুরা এতই দুর্বল ও নিরুপায় যে কোন মেয়ে বা বৌ অন্য সম্প্রদায়ের কারো দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে এলেও এই সমাজে বা ধর্মে ঠাঁই মেলে না। বিশেষ করে নারীর উপর অত্যাচারের আশঙ্কায় হিন্দু সমাজ সর্বদা আতঙ্ক গ্রস্ত। এই নড়বড়ে আত্মাভিমানী শুচিবাই গ্রস্ত সমাজকে কিছু সুযোগ সন্ধানী দুষ্ট প্রকৃতির অহিন্দুরা নাড়া দিতে থাকল। নারীলোলুপতার পশ্চাতে রয়েছে তাদের অর্থনৈতিক মুনাফা। অতীতের অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা জানে নারীর প্রতি হাত বাড়ালেই হিন্দুরা সব কিছু ফেলে রেখে ভারতের দিকে ছুটবে। আর সেই ফেলে যাওয়া সম্পত্তি নিজেদের ভোগ—দখলে আসবে। দুঃখের বিষয় এর প্রতিকারে হিন্দুরা কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা কখনও গড়ে তুলেছে কিনা জানা যায় না—এও জানা যায় না তারা যাচাই করে দেখেছে কিনা দেশের মাটিতে তাদের সুসম্মানে বসবাস করার অধিকার আছে কি নেই।

অহিন্দু সকলেই যে এই প্রকৃতির তা নয়। অনেক উদার ব্যক্তি বহু হিন্দুকে বিপদে আশ্রয় দিয়ে তাদের মা-বোনেদের ইজ্জত বাঁচাতে সাহায্য করেছেন। দেশের সরকার তথা পুলিশ বাহিনীও নানা ঘোষণার মাধ্যমে সংখ্যা লঘু জনগনকে অভয় দিচ্ছেন। তা সত্বেও ভয়তাড়িত হিন্দু-নরনারী অভয়ভূমি ভারতের দিকে ছুটছে।

গোপার কাকা দীননাথ পশ্চিমবঙ্গে কাঁচড়াপাড়ায় রেলের চাকরি করে। দাদা হরনাথকে সে অনেকবারই দেশের বাস গুটিয়ে সেখানে চলে যেতে বলেছে। কিন্তু হরনাথ দেশের টাট্‌কা মাছ—দুধের লোভে সে পরামর্শ কখনও শোনেননি। এবার বড মেয়ে গোপার দিকে তাকিয়ে তাঁর বুক কেঁপে উঠল। ওর বয়স বেশী না হলেও এরই মধ্যে বেশ বেড়ে উঠেছে। গোপার বড় আকর্ষণ তার চেহারা। এই লাবণ্যই যে কোন মুহূর্তে ওর বিপদ ডেকে আনতে পারে। অতএব হরনাথকেও দেশ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে হল। খবর নিয়ে জানলেন ভারতে যাবার ভিসা-পাসপোর্ট বন্ধ হয়ে গেছে। হিন্দুদের জমি-জায়গা বিক্রি বা রেজিষ্ট্রিও সরকার থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রেজিষ্ট্রি না হলেও কিন্তু বিক্রী বন্ধ নেই। গোপনে চুক্তি পত্রে সই করে হাজার টাকার মাল দু'তিনশো টাকায় বিক্রী হচ্ছে, দশ-বারো হাজার টাকার সম্পত্তি দেড়-দুই হাজারে বিকিয়ে যাচ্ছে। স্থাবর অস্থাবর কোন কিছুই বাকী থাকছে না। প্রাপ্য টাকার উপর আবার শতকরা দশ-পনের টাকা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন তহবিলে দান করতে হচ্ছে। হিন্দুরা আর এখন কোন কিছুতেই পিছপা নয়, শুধু কোন রকমে মা বোনের ইজ্জত বাঁচিয়ে জীবন নিয়ে ভারতে পৌছানো চাই। সরকার অনুমতি পত্র না দিলেও অন্য পন্থা আছে। দালালরা সীমান্ত পার করে দেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। হরনাথকেও শেষ পর্যন্ত দালালের শরনাপন্ন হতে হল।

গত কয়েকদিন যাবৎ গোপা বড়ই উদ্বেগের মধ্যে দিনযাপন করছে। সারাক্ষণ পথ চেয়ে আছে কখন গোকুল আসে। তার বড় আশা ছিল বিদায়ের আগে গোকুলের সঙ্গে শেষবারের মত কিছু কথা কয়ে তার মুখ দেখে সে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করবে। কিন্তু তার এই ছোট আশাটুকু পূর্ণ হলনা। গোকুল বাড়ী আসেনি। অবশেষে অত্যন্ত বিমর্ষ চিত্তে সেদিন গভীর রাতে গোপা সকলের সাথে অন্ধকারে পা টিপে টিপে নদীর ঘাটে গিয়ে ছই ঘেরা টাপুরেতে উঠল। প্রথম বর্ষার ভাটির টানে ছোট নৌকা দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে। দুপাশে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক পাড মাতিয়ে রেখেছে। আকাশে শ্রাবন মেঘ তারাদের মুখ ঢেকে রেখেছে। মাঝে মাঝে পশলায় পশলায় বৃষ্টি নামছে। সেদিন বোসপুকুরের পাড়ে দুজনের বৃষ্টিতে ভেজার সেই স্মৃতিতে গোপা এখন বুঁদ হয়ে আছে। পঞ্চদশী কিশোর গোকুলের জন্য ত্রয়োদশী গোপার হৃদয়ের অন্তস্থলে বিচ্ছেদ বেদনার যে উত্তাল ঢেউ উঠেছে সে কেমন করে সামাল দেবে বুঝে উঠতে

পারছে না। সে ফ্রকের ঝুলে পড়া অংশ দুহাতে ধরে চোখে চাপা দিয়ে বেপরোয়া অশ্রুপ্লাবণকে বাগ মানানোর বৃথা চেষ্টা করছে।

সারারাত চলার পর ভোরবেলা মাগুরার ঘাটে এসে আছিরদ্দি তার টাফুরে বাঁধল। সকলে নেমে যাবার সময় সে ছলছল চোখে বলে উঠল—হরুদা মোছলমান হতি পারি কিন্তু জীবনে কহনো ভাবিনেই তুমরা হেঁদুরা আমাগের শত্তুর, যারা তুমাগের এমন করে ভিটে-মাটি ছাড়া দ্যাশ ছাড়া কল্লে, আল্লা যেন তাগের ক্ষ্যামা না করে! ছোটকালে আব্বা মারে তালাক দিইছিল, তুমরা না থাকলি আমি এতবড্ডা হতি পাত্তামনা! মারে মাটি দিইছি, আর তুমারে, বেরজো দিদিরে তাড়ায়ে দেলাম, আল্লা আর কি দুঃকু দিতি পারে দেহি! সে লুঙ্গির খুট চেপে ধরে চোখের জল মুছল।

তার অবস্থা দেখে হরনাথ, ব্রজবালা, গৌরী, গোপা, শিবানী সকলের চোখে জল ছাপিয়ে উঠল। ব্রজবালা আর হরনাথ সেখানে দাঁড়িয়ে নৌকাজীবি আছিরদ্দিকে সান্ত্বনা দিয়ে আস্তে আস্তে তাঁরা ঘাটের উপরে উঠে এলেন।

একটা হোটেলে আশ্রয় নিয়ে চান করে বেলা আটটা নাগাত ভাজা মাছ আর ডাল দিয়ে কোন রকমে খাওয়া সেরে সকলে বাসে উঠল। এই হেটোলে থেকেই তাদের সঙ্গের লোকটির বদল হয়েছে। তারা প্রথম দালালের হাত থেকে দ্বিতীয় দালালের হাতে পড়েছে। কয়েকবার বাস পাল্টে এবং বিভিন্ন জায়গায় অপেক্ষা করে সন্ধ্যার পরে তারা কালীগঞ্জের কাছে এক হাইস্কুলে আশ্রয় পেয়েছে। পূর্ব পরিকল্পনা মতো আরও কিছু পরিবার এখানে এসে পৌছাল। সব মিলিয়ে লোক সংখ্যা দাঁড়াল শতাধিক। এখানে আলো জ্বালা বারণ, কথা বলা নিষেধ। সবই হচ্ছে কিন্তু চুপি চুপি। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে হয়েছে মুস্কিল। তারা নানারকম অসুবিধায় পড়ে চিরাচরিত পন্থা স্বরূপ কান্নাকাটি করছে। চুপি চুপি ধমক খেয়ে আরো বেশি জোরে চিৎকার করছে। তাদের দোষ গিয়ে পড়ছে মায়েদের উপর, হচ্ছে নিচু স্বরে বচসা। এখানে রান্না বারণ। আবার একসঙ্গে বেশি লোকও হোটেলে যেতে পারবে না। পালা করে কিছু কিছু লোক গোপনে খাবার কিনে নিয়ে এসে অন্ধকারে তাই-ই পোকা-মাকড়ের সঙ্গে পেটে চালান করে দিচ্ছে।

সকাল বেলা মাগুরা ছাড়ার পর জল ছাড়া আর কিছু কারো পেটে পড়েনি। হরনাথ অন্য সকলের মত চুরি করে হোটেল থেকে খাবার কিনে আনলেন। অত্যন্ত খিদের তাড়নায় তিনি খেলেন, শিবানীও কিছু খেল, কিন্তু গৌরী,

ব্রজবালা বা গোপা তারা কেউই কিছু মুখে দিল না। গোপা এখানে এসে অবধি সানের মেঝেয় চুপ করে শুয়ে আছে, তার মুখে কোন কথা নেই।

গভীর রাত্রে হঠাৎ একটা গোলমালের শব্দ শুনে হরনাথের তন্দ্রা কেটে গেল। তিনি দেখতে পেলেন অনেকেই ছুটাছুটি করছে। মেয়েরা চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। ইতস্তত জোড়ালো টর্চের আলো এসে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। গৌরী, গোপা, শিবানী সকলেই হরনাথকে আকড়ে ধরেছে। ডাকাত পড়ল নাতো? একটু পরে বোঝা গেল ডাকাত নয়, পুলিশ বাহিনী স্কুল বাড়ী ঘেরাও করেছে। এখন পলায়নের চেষ্টা বৃথা। হরনাথ সকলকে শান্ত ও সংযত থাকতে অনুরোধ করলেন। পুলিশরাও ভয় দেখাচ্ছে এরা পালানোর চেষ্টা করলে গুলি করে মারবে—বিচিত্র কিছু নয়। সকলে শান্ত হলে পুলিশ একে একে একে সকলকে ধরে মালপত্র সহ গাড়ীতে ওঠাল। থানায় নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরে রাখল। এদের অপরাধ দেশের সরকারের বিনা অনুমতিতে মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে ভারতে চম্পট দিচ্ছে।

হাজত ঘরের স্যাতসেতে মেঝেয় বসে হরনাথ ভাবছে স্ত্রী কন্যার ইজ্জত বাঁচানোর তাগিদে পিতৃ পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে সর্বস্ব খুইয়ে অন্য কোনও নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার প্রচেষ্টাতে যদি অপরাধ হয়, শাস্তি ভোগ করতে হয়, তবে পরস্ত্রীর সতীত্ব নাশ, পরকন্যা অপহরণ করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মান্তরিত করে তার যৌবনের সম্পদকে লুটেপুটে খাওয়ার অপরাধে ঈশ্বর কোন্ শাস্তির ব্যাবস্থা করেছেন?

পরদিন সকালবেলা কয়েকজন কনেষ্টবল সতর্ক পাহারায় একে একে সকলকে প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদনের জন্য কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে দিয়ে আবার হাজত বন্দি করে রাখল। বেলা আটটার পরে গেলাস বাটি ঘটিতে প্রত্যেককে চা নামে এক রকম খয়রী রঙের গরম জলীয় পদার্থ সরবরাহ করল।

দুপুরে এক এক হাতা খিচুরি খেয়ে যখন সকলে হাজতের মেঝেয় বসে রাত্রি জাগরণ হেতু ঝিমুতে ঝিমুতে একজন অন্যজনের গায়ে ঢলে পড়ছে তখন বড় দারোগার ঘরে হরনাথ সহ বিশিষ্ট কয়েকজনের ডাক পড়ল। সকলে উপস্থিত হলে তিনি ইতিমধ্যে পাওয়া তালিকার সঙ্গে এদের নাম. বাসস্থান, পেশা, দেশ ত্যাগের কারণ, এ বিষয়ে সহায়ক ব্যক্তি, তারা কে কতটাকা নিয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারপর তিনি অত্যান্ত মার্জিত

ভাষায় এদের কৃত অপরাধ ও আইনের চোখে সাজা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাখ্যা করে সকলকে বুঝিয়ে দিলেন। অবশেষে সকলে তার কথায় সন্তুষ্ট হলে তিনি প্রত্যেককে নিজের নিজের বাসস্থানে ফিরে যাবার অঙ্গীকার করিয়ে মুচলেকা নিলেন। সকলে হাজতবাস ও অন্যান্য সম্ভাব্য হয়রানি থেকে নিষ্কৃতি পেল।

এর পরই দেখা গেল যারা টাকার বিনিময়ে বে-আইনী ভাবে এদেরকে সীমান্ত পার করে দিতে চেয়েছিল সেই দালালদের অনেককেই ধরে আনা হয়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এতক্ষণ যে মুসলমান বড় দারোগাকে নিতান্ত শান্তশিষ্ট পুলিশ বাহিনীর অনুপযুক্ত মনে হয়েছিল এখন দেখা গেল তিনি যেমনি বিনয়ী তেমনি কর্তব্যে কঠোর এবং অপরাধীর কাছে ভয়ঙ্কর। তিনি নিজে হাতে বেত নিয়ে দালালদেরকে আচ্ছা করে পিটিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করছেন এবং এদের দেওয়া টাকা ওদের কাছ থেকে বের করে নিচ্ছেন। দালালদের বেপরোয়া আত্মসাৎ ও অশালীন ব্যবহারে যারা ইতিমধ্যে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল তারা এই রকম শাস্তি দেখে খুশিই হল। কিন্তু যাদের আত্মীয় এই শাস্তির আওতায় পড়েছে তারা বড় দারোগার মুণ্ডপাত করছে। দালালকে দেওয়া আগাম আটশো টাকা মার গেলেও হরনাথ বড় দারোগার কাজে সন্তুষ্ট না হয়ে পারলেন না। যে টাকা দালালদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে উপযুক্ত প্রাপকের হাতে তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। হরনাথের মত কয়েকটি পরিবার ছাড়া প্রত্যেকেই তাদের ছয় আনা আট আনা পরিমান অর্থাৎ তিন-চারশো টাকা ফেরৎ পেয়েছে।

সেদিন সব কিছু নিস্পত্তি হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। এই অসময়ে এরা কোথায় যাবে বিবেচনা করে বড় দারোগা সকলকে বলে পাঠালেন এরা রাজী থাকলে আজ রাতে এই থানা প্রাঙ্গনে থেকে যেতে পারে। চাল ডাল ইত্যাদি কিনে দিলে থানার মেসে রান্না করে দেওয়া হবে। এ অতি উত্তম প্রস্তাব। সানন্দে সকলেই রাজী হল। রাত্রে আহারাদির পর ছুটো ঘরে যে যেখানে পারল বিছানা পাতল। গত রাত্রে বাস করা হাজত ঘরের দরজা উন্মুক্ত রেখে সেখানে আজ বিছানা পেতে আরাম করে শোবার ব্যাবস্থা হল। তাতেও কুলাচ্ছেনা দেখে বড় দারোগা, মেঝে দারোগার কোয়ার্টারের বারান্দায় কিছু কিছু লোক শুতে গেল।

পরদিন সকালে হরনাথ বড় দারোগার বাসায় গিয়ে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন। গ্রামে ফিরে যাওয়ার মুচলেকা দিলেও তিনি সেখানে যাওয়ার কোন মানসিকতা খুঁজে পেলেন না। সেখানে ইতিমধ্যে জানাজানি হয়ে গেছে

তিনি ইণ্ডিয়ায় চলে গেছেন। সেখানে ফিরে গিয়ে কোন বিপত্তি যে হবে না কে বলতে পারে!

ঝিনাইদহ বাস স্টপেজে নেমে দেখা গেল একখানা অটো রিক্সার গায়ে লেখা আছে "ঝিনাইদহ গারা-গঞ্জ।" গারাগঞ্জে হরনাথের এক নিকট আত্মীয় তারাপদ থাকেন। তিনি সেখানের হাইস্কুলের মাষ্টার। অনেকবার হরনাথকে সপরিবারে আসার অনুরোধ করেছেন, কিন্তু হরনাথের যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

ড্রাইভার অনেক খোঁজাখুঁজির পর তারাপদ মাষ্টারের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে গোপাদের নামিয়ে দিল। বাড়ীর সকলে সাদরে সকলকে অভ্যর্থনা জানাল।

কয়েকটা দিন এখানে আদর আপ্যায়নের মধ্যে তাদের কাটল। ইতিমধ্যে জানা গেল তারাপদর ছেলে সুধীরের সহপাঠী আকবর। আকবরের ছোট চাচা পুলিশে চাকরি করে, বর্তমানে দর্শনা বর্ডারে পোষ্টিং আছে। সে ইচ্ছা করলে বর্ডার পার করে দিতে পারে। তারাপদর অনুরোধে একদিন আকবর আর সুধীর হরনাথদের সঙ্গে করে দর্শনায় ইদ্রিস হাবিলদারের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সেইদিন রাত্রের ট্রেনেই ইদ্রিস মোল্লা এক শুল্ক অফিসারের সাহায্যে তাদেরকে বর্ডার পার করে দিল। তবে ইদ্রিসের সঙ্গে তার যা চুক্তি হয়েছিল তা ছাড়াও অফিসারটি হরনাথকে একা পেয়ে শেষ মুহূর্তে গোপার মায়ের তিনভরি ওজনের সোনার হারগাছা নিয়ে নিল। হরনাথ এ খবরটা ইদ্রিস মোল্লাকে দেওয়ার কোন সুযোগ পেল না।

৫

মামাবাড়ীতে গিয়ে গোকুলের মন টিকছে না। বারবারই মনে হচ্ছে সে বাড়ী ফিরে যায়। তার নিজের গ্রামের প্রতিটি ছবি প্রতিটি স্মৃতি মনের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। এক একটা দিন যেন এক একটা বছরের সমান হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। তার সীমিত শক্তিতে যেন সময়ের চাকাকে কিছুতেই ঠেলে সরাতে কিংবা নড়াতে পারছে না। ভেবেছিল দুর্গা পূজার ছুটির সময় বাড়ী গিয়ে কিছুদিন সে থেকে আসবে। কিন্তু সেই সময় আবার অসুখে পড়ে তার সকল আশা নির্মূল হয়ে গেল। ইতিমধ্যে বাড়ী থেকে বাবার চিঠি এল গোকুল যেন ভালোমত পড়াশুনা করে; আগামী ম্যাট্রিক পরীক্ষায় যাতে তার পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হয়। কাজে কাজেই সে বাড়ী যাওয়ার কথা মুখে আনতে পারল না; কারণ তার মেজ মামা তাহলে তাকে আস্ত রাখবে না।

টেষ্ট পরীক্ষাটা হয়ে গেছে। তার ফলাফল ভালো হয়েছে। এবার গোকুল মরিয়া হয়ে উঠেছে বাড়ী সে যাবেই। ভোর না হতেই সে বেরিয়ে পড়েছে। হাঁটা পথে চার-পাঁচ ঘণ্টা হাঁটলেই সে বাড়ী পৌঁছে যাবে।

ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহ। কয়েকদিন পরে দোল। এবার হোলীর সময় বাড়ীতেই সে থাকতে পারবে। কাকে কাকে রঙ মাখাবে সে মনে মনে একটা তালিকা তৈরি করে ফেলল। মাঠের বুক ভরা দানা বাঁধা মটর শুটি। আম গাছে মুকুল থেকে গুটি বাঁধতে শুরু করেছে। এক ধরনের টকমিষ্টি ঘ্রান এসে নাকে লাগছে। মৌমাছিরা সুর তুলে মধুপানে মত্ত হয়েছে। পুঁয়ো গাছে আমের মতই বউল বেরিয়েছে! খেঁজুর গাছে চমর বেরিয়েছে। একটা কিশোরী মেয়ে অপটু শাড়ী পরে কয়েকটা ছোট ছোট মেয়ের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করতে করতে গোকুলের পাশ দিয়ে পিছনের পাড়ায় গিয়ে ঢুকল। তার মিষ্টি মুখের উপর দৃষ্টি পড়ামাত্র গোকুলের মনটা আনন্দে নেচে উঠল। তার গোপা নিশ্চয়ই এতদিনে এর থেকে আরও ভালো দেখতে হয়েছে। সে কিশোরী গোপার ভাবনায় ডুবে গেল। মনে পড়ল সেবারের সেই পুকুর পাড়ে দেখা হওয়ার কথা, খেলার ছলে মালা বিনিময়ের কথা, সেই কাজলী হারিয়ে যাওয়ার কথা; তাহলে তো গোপা তারই হয়েছে। তার সেই কথাটার মানেও সে এতদিনে জানতে পেরেছে। এবার গিয়ে গোপাকে মানেটা সে বুঝিয়ে দিয়ে আসবে। আর তো তাকে তুই বলা যাবে না; এবার তাহলে তাকে তুমি বলবে? তুমি! তুমি! তুমি!—বাঃ বেশ লাগছে তো!

মাঠের মধ্যে এক গাছে কুল পেকে লাল হয়ে আছে। সে কুড়িয়ে একটা মুখে দিয়ে দেখল বেশ লাগছে। সে অনেকগুলো কুল ব্যাগে পুরে হাঁটা দিল। বেশ কিছুদূর এসে দেখল একগাছে পাতা একটাও নেই; থলো থলো আমড়া ঝুলছে। ছোট বেলার অভ্যাস বশে একখানা ত্রিশূল গাছের ডাল ভেঙে (চ্যাঙা) সেখানা উপরের দিকে ছুঁড়ে দিতেই একসঙ্গে অনেকগুলো আমড়া মাটিতে পড়ে গেল। একটা তুলে নিয়ে ব্যাগের গায়ে ঘসে ময়লা তুলে তার গায়ে কামড় দিয়ে দেখল টক্ টক্ মিষ্টি মিষ্টি চমৎকার স্বাদ। সে দশ-বারোটা আমড়া ব্যাগে ভরে নিল। গোপা আর শিবানী এগুলো খেতে বড় ভালো বাসে;

খেয়াঘাট পার হয়ে তাদের রতনপুর গ্রামে পা রাখতেই গোকুলের মন

জুড়িয়ে গেল। এইতো এসে পড়েছে। পথের ক্লান্তি তার একটুও নেই। যাকে দেখার জন্য তার মন এতদিন ছটফট্ করছিল সেই গোপা, 'তার নিজের মা সকলে এখানেই আছে যে!

গোপাদের বাড়ীর সামনে পৌঁছে সে অবাক হ'ল। সেখানে দশ বারোটা গরু, ছয়-সাতটা মোষ, আর গোটাকতক ছাগল বাঁধা রয়েছে। এমনতো থাকে না! তারপর গাছগাছালিও কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে! তার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। সে গোপালপুরে থাকতে কিছু কিছু শুনেছে বটে অনেক হিন্দুরা ভারতে চলে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের গ্রামের সম্পর্কে তো কিছু শোনেনি?' এ তল্লাটে তাদের গ্রামে এখনও হিন্দুর সংখ্যা বেশি এবং হিন্দুদের প্রতিপত্তিও বেশি বলেই সে জানত। সে ভুল দেখছেনা তো? ওই তো সেই টিনের দরজা। দ্বিধাগ্রস্ত মনে দরজা ঠেলতেই একপাল মোরগ মুরগী চিৎকার করে এদিক সেদিক ছিটকে সরে গেল। আর তখনি সে দেখতে পেল বারান্দায় বসে ওপাড়ার জুমারত সেখ। সে তাকে ডেকে বলল—কে ওডা, নকুলির ছাওয়াল (ছেলে) না?

গোকুল ধীরে জবাব দেয়—হ্যাঁ আমি, হরকাকারা গেলেন কোথায়?

জুমারত সেখ দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন—ওহ্ তুমি বুঝি কিছু জানো না? হরনাথ হেন্দুস্থানে গেছে। আমি এ বাড়ী কবলা করে নেছি। তা বসে পান তামুক খাবা?

গোকুলের বড় রাগ হল। সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—না, ওসব আমি খাইনে।

—তয় বাপু জিরোয়ে চিড়েগুড় খায়ে যাও…

গোকুল সে কথার কোন জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে বাড়ীর দিকে হাঁটা দিল। পথে দেখল কুণ্ডুপাড়া, দত্তপাড়া, বিশ্বাসপাড়া, পালপাড়ার অনেকেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। অনেক কষ্টে, রাগে, দুঃখে, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে বাড়ীতে ঢুকে বলল—মা আমাদের গ্রামের এ কি হাল হয়েছে? এত সব লোক গেল কোথায়?

ননীবালা বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে দিয়ে বললেন—এসেছিস যখন বাবা সবই একে একে জানতে পারবি। লোকে কি আর সাধে চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যায়? জিরিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বস।

একটু পরে অত্যন্ত নিস্পৃহ হয়ে খেতে খেতে গোকুল জানতে পারল এ গ্রামে হিন্দুর মেয়ে বৌদের একা একা পথে ঘাটে বের হবার উপায় নেই। কখন কে কাকে ধরে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। হিন্দুদের ব্যাবসা-বাণিজ্যও বন্ধ হবার উপক্রম। অহিন্দুরা মাঝে মাঝেই দাম না দিয়ে নিজ হাতে মাল তুলে নিয়ে চলে যায়। প্রতিবাদ করতে গেলেই মার খেতে হবে। হিন্দুদের পুকুরের মাছ, গাছের ফল কিছুই প্রায় থাকছে না।

খাওয়ার শেষে গোকুল বাঁশি হাতে নিয়ে পায়ে পায়ে বোসেদের পুকুরের পাড়ে এসে বসল। অনেকক্ষণ ধরে একটানা বাঁশি বাজাল। যাকে কেন্দ্র করে তার এই সুরের মহড়া সে এখন কোথায় কে জানে! আর কি তার সঙ্গে এ জীবনে তার দেখা হবে? গোকুলের চোখে অশ্রু টলমল করে উঠল। অনেক দিন আগে গোপা তাকে যেখানে দাঁড করিয়ে পায়ের উপর পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিল সেখানে গিয়ে মাটির দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সেদিন মালা গেঁথে বাড়তি লতাটুকু গোপা যেখানে ফেলে দিয়েছিল মাটির রসে এখন সেখানে জীবন্ত লতা শোভা পাচ্ছে। গোকুল সেই লতার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল। বকুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করতেই গোকুলের মনে হল কিশোরী গোপা গাছের পিছনে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। সে উদভ্রান্তের মত জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অবশেষে গোপাদের বাড়ী অর্থাৎ বর্তমানে জুমারত সেখের বাড়ীর দরজায় গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল – চাচা হরকাকা কি কোন ঠিকানা রেখে গেছেন? কিংবা সেখানে যাওয়ার পর কোন চিঠিপত্র……?

—না তো বাপজান কোন ঠিকানা রাখে যায়নি। আর চিঠি দিলি তো তুমাগের হেঁদু পাড়ারই কারো কাছে দিতি পারে, আমি কিছু বলতি পাল্লাম না।

সেখান থেকে বের হয়ে গোকুল ব্যথা ভরা মন নিয়ে ক্লান্ত পদবিক্ষেপে বাড়ীতে এসে ঢুকল। বই এর আলমারী খুলে এককোণে রাখা বকুল ফুলের শুকনো মালাটা হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে আবার সেখানে রেখে দিল।

দুপুর গড়িয়ে গেলে নকুল দত্ত অপ্রসন্ন মুখে বাড়ী ফিরে এলেন। ননীবালার কথার উত্তরে তিনি বললেন – না এবারও জমির ধান দিল না। বলছে "ধান কম হইছিল হাওলাত শোধ করতি সব ফুরোয়ে গেছে, চোতেলী খন্দ উঠলি নগদ

টাকা দেব।" তাই যদি সত্যি হয় তবে এতদিন মিথ্যে কথায় ঘুরালি কেন ? তুমি ভাবছ আমি ওই টাকার আশা করছি ? আমি কি ওদের চিনি না ?

ননীবালা বললেন—যাক যা হবার হবে, তুমি আর ওসব নিয়ে গণ্ডগোল করোনা, মানে মানে থাকো যত দিন পারো……

—আরে আমি কোথায় গণ্ডগোল করছি ? গণ্ডগোল তো ওরাই বাঁধাতে চাইছে ; আমার অংশের ধান নিজের গোলায় তুলে রেখে শুধু নয় ছয় কথা বলে ঘোরাচ্ছে। জোটো মিয়েও ধান না দিয়ে কেবলই আজ-কাল করে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। এমন হলে তো সকলে না খেয়ে মারা প'ড়ব !

—যাক তুমি এখন ডুব দিয়ে এসে খেতে বস বেলা দ্যাখো গড়িয়ে গেছে।

—এই যাই, ও ঘরে কে ? গোকুল এসেছে নাকি ?

বাবার কথায় গোকুল ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করল।

—থাক্ থাক্। শরীর ভালো আছে তো ?

—হ্যাঁ ভালো আছি। গোকুল নত মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

—বাবা সব সময় বাড়ীতে থেকো, রাত বিরাত যেখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি করোনা দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে। নকুলবাবু তেল মেখে গামছা নিয়ে বাড়ীর পিছনে পুকুরে চান করতে গেলেন।

এরপর গোকুল যে কয়দিন বাড়ীতে ছিল সে প্রত্যেকদিন একবার করে বোস পুকুরের পাড়ে গিয়ে বকুল গাছের নিচেয় দাঁড়াত। কিছুক্ষণ বাঁশি বাজিয়ে মনের বেদনা লাঘব করে ধীর পায়ে বাড়ী ফিরে আসত। সপ্তাহ খানেক কোন ক্রমে অতিবাহিত হলে আর তার বাড়ীতে মন টিকল না। সে বই পত্র গুছিয়ে ব্যাগে ভরে আবার গোপালপুরের রাস্তা ধরল।

৬

মনে পড়ে সেই দিনটির কথা যেদিন হরনাথ সর্বস্বান্ত হয়ে সন্ধ্যার কিছু পরে কাঁচরাপাড়া স্টেশনে স্বপরিবারে উদ্বাস্তু হয়ে নামলেন। রিক্সাওয়ালারা বেশি পয়সার লোভে মাইল খানেক ঘুরে ঘুরে দীননাথের কোয়ার্টার খুঁজে বের করল! দীননাথ তখন সবে অফিস থেকে ফিরে এসেছে। দরজা খুলে দাদা বৌদি ও বড়দির পায়ের ধুলো নিয়ে সকলকে সাদরে ভিতরে নিয়ে এল। বাবার দেখাদেখি মান্তু ও সন্তু জেঠামশাইকে প্রনাম করল। হরনাথ ছোট ভাইপোকে কোলে তুলে নিয়ে তার হাতে আমসত্ব দিলেন। অনেক কষ্টে সের দুই আমসত্ব দেশের থেকে তিনি লুকিয়ে আনতে পেরেছেন। কাঁচরাপাড়া

স্টেশনে নেমে আগে খানিকটা পকেটে পুরে রেখেছিলেন। তার দেখাদেখি গোরী একটা পুটুলি খুলে কৌটার মধ্য থেকে কুলের আঁচার বের করে মান্তুর হাতে দিলেন। এই সময় গোপা জামার ছোট পকেট থেকে লজেন্স বের করে দু'ভাইয়ের হাতে দিল। মুস্কিলে পড়েছে শিবানী। সে রেগে গিয়ে বলল— বা তোমরা তো বেশ লোক! আমাকে বোকা বানিয়ে ছাড়লে? তোমরা সকলে ওদেরকে এটা-সেটা দিলে আর আমি বুঝি কিছু দিতে পারব না? তা হবে না, বাবা পয়সা দাও, আমি ওদেরকে চানাচুর খাওয়াব।

দীননাথ বলল—আচ্ছা কাল খাওয়াস, আমি তোকে কিনে এনে দেব।

—না তুমি দিলে হবে না, বাবার কাছ থেকে পয়সা নেব।

—আচ্ছা আচ্ছা এই নে ধর! হরনাথ পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে শিবানীর হাতে দিতে সে শান্ত হল।

বহুদিন পরে দুই ভাই, বৌ, তাদের ছেলে মেয়ে সকলকে এক সঙ্গে দেখে ব্রজবালা খুব খুশি হয়েছেন। তিনি দীননাথের দিকে তাকিয়ে বললেন—কতদিন পরে তোদের মুখ দেখলাম রে! সেই যে বৌ নিয়ে চলে এলি আর দেশে ফিরলি নে।

দীননাথ উত্তর দেয়—যাওয়ার তো ইচ্ছে করে দিদি কিন্তু যাওয়া-আসা কত ঝঞ্ঝাট বল তো? আজ পাশপোর্ট বন্ধ, কাল ভিসা বন্ধ, একে ধর, তাকে ধর কত যে ফ্যাচং সে আর কি বলব দিদি!

এই সময় দীননাথের স্ত্রী কমলা এসে বলল—দিদি বড়দাকে আহ্নিক সারতে বলুন আমার জলখাবার তৈরী হয়ে গেছে। সে ব্রজবালার দিকে ফিরে বলল— আপনিও সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে নিন। গোপা, শিবানী তোমরাও বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এ'স।

গোপা হেসে বলল—ও কাকী তোমাকে কিন্তু এখনও প্রনাম করা হয় নি।

সে পায়ে হাত দিতে গেলে কমলা সরে গিয়ে বলল—থাক থাক আমাকে আর ওসব করতে হবে না, এমনি আশীর্বাদ করছি—ভালো থাক, সুখে থাক। এবার সে স্বামী দীননাথের দিকে ফিরে বলল—ওগো একবার বাজারে যাও, স্টেশন বাজারে গিয়ে ভালো দেখে মাছ নিয়ে এস। কলোনীর বাজারে এখন মাছ পাবে না। কাছেই রেলকোয়ার্টারের পূর্বপ্রান্তে কলোনীর ধারে একটা বাজার বসে, জিনিসপত্র একটু কম দামে পাওয়া গেলেও ভালো জিনিস

সকালের দিক ছাড়া পাওয়া যায় না। দীননাথ বাজারের থলি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাত্রে আহারাদির পর একঘরে হরনাথ ও দীননাথ শুয়েছে। অন্য ঘরে খাটে সকল ছেলে মেয়ে এবং মেঝেয় বিছানা পেতে তাতে দুই বৌ আর ব্রজবালা শুয়েছেন। দুই ঘরেই দেশের কথা, রাস্তার নানা অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করতে করতে সকলের প্রায় রাত্রি কাবার হয়ে গেল।

রেলকোয়ার্টারে দুইখানা বড় বড় ঘর। রান্নাঘর আলাদা। সামনে পিছনে বারান্দা। এতদিন কমলার ছোট সংসারের পক্ষে বড়ই বেমানান লাগত। এখন সে অভাব দূর হয়েছে। একখানা ঘরে তারা স্বামী-স্ত্রীতে দুই ছেলে নিয়ে থাকে। অন্য ঘরে থাকেন হরনাথ, গৌরী আর শিবানী। গোপা আর ব্রজবালার জায়গা হয়েছে রান্নাঘরে। বাড়ীর ঠাকুর দেবতারাও এই ঘরেই আশ্রয় পেয়েছে। ভিতরের বারান্দার একদিকে ঘিরে রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে।

সময় কাটাতে যাতে অসুবিধা না হয় এই ভেবে দীননাথ দাদাকে রেল কোয়ার্টারের বাইরে একটা লাইব্রেরীর সদস্য করে দিয়েছে। হরনাথ বাড়ীতে চার ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার তদারকি করে এবং লাইব্রেরীর বই পড়ে দিন কাটিয়ে দেন। প্রথম জীবনে তিনি কিছুদিন গ্রামের স্কুলে মাষ্টারী করেছিলেন। কিন্তু পরে অন্য জায়গায় বদলি হওয়ায় তিনি মাষ্টারী ছেড়ে দেন। তারপর নিজেদের জমাজমির দেখাশুনা করেই জীবন কাটিয়ে আসছিলেন। তাতেই মা অন্নপূর্ণা মুখের অন্ন জুগিয়ে গেছেন। সেই ভাবেই বরাবর চলবে ভেবেছিলেন, তাই সময় থাকতে কোন ব্যবস্থা করেননি। আঠারো বিঘে সম্পত্তির মধ্যে মাত্র পাঁচ বিঘে গোপনে রেজিষ্ট্রি ছাড়া জলের দামে তিনি বিক্রী করে এসেছেন। দু'মাস বসে খেতে আর আসার সময় রাস্তায় দণ্ড দিতে দিতে সে টাকা সবই ফুরিয়ে গেছে। বারো বছর আগে দীননাথ দেশ থেকে আসার সময় তার নতুন সংসার গোছানোর জন্য হরনাথ যে তিন হাজার টাকা দিয়েছিলেন তা ছাড়া তিনি আর কিছু করতে পারেন নি। যা তিনি করেছেন তার বর্তমান মূল্য বলতে কিছু নেই। তিনি বাকী তের বিঘের দলিল ভাই এর হাতে তুলে দিয়েছেন। যদি ভবিষ্যতে দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হয়, যদি হিন্দুদের সম্পত্তি আবার বিক্রী করার আইনতঃ অধিকার পাওয়া যায়; আর যদি বিক্রয়ের টাকা এদেশে নির্বিঘ্নে নিয়ে আসা যায় তবেই এর মূল্য স্বীকৃত

হবে, নইলে এর কোন দাম নেই। এতগুলো যদিকে উপেক্ষা করে সেই সম্পত্তিকে মুল্যবান মনে করা নীরেট আহাম্মকী ছাড়া আর কী ?

কয়েকমাস যেতে না যেতেই হরনাথ বেশ অনুভব করলেন দীননাথের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। বাজার দাম হু-হু করে বাড়ছে। এই অবস্থায় এতগুলো লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের দায়িত্ব কাঁধে চাপিয়ে ধকল সামলাতে দীননাথ ইতিমধ্যে যে দীনদশার মধ্যে এসে পড়েছে, তা যতই ঢাকার চেষ্টা হোক এই সহজ সত্য আলগা হয়ে পড়ছেই। যেখানে যতটুকু সঞ্চয় ছিল তা নিঃশেষ হয়ে এর-তার কাছে হাত পাততে হচ্ছে। এ সকল বুঝতে পেরেও হরনাথকে চুপ করে থাকতে হচ্ছে। তিনি কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁরা পাচটি প্রানী এই সংসারে বেশ আদরেই আছেন বটে তবুও ভিতরে সংসারের বুকে যে ফাটল ধরেনি একথা আজ আর জোর দিয়ে বলা যায়না। তিনি বুঝতে পারেন দীননাথ সামনে আসা কমিয়ে দিয়েছে। তার সেই হাসিখুশি ভাব কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। কমলাও আজকাল কত গম্ভীর হয়ে গেছে। অথচ কিভাবে অংশ নিয়ে এর সমাধান করা যায় হরনাথ তা বুঝতে পারেন না।

জৈষ্ঠ মাসের গোড়ায় একদিন লাইব্রেরী থেকে ফিরে এসে হরনাথ দেখলেন তাদের গ্রামের গৌরকুণ্ডু এসেছে! দেশে থাকতে ছোটবেলায় গৌর দীননাথের সঙ্গে পড়াশুনা করেছে। কয়েক বছর আগে সে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসে। গৌর পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম করলে হরনাথ আশীর্বাদ করে অবশেষে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা এখন কোথায় আছ গৌর ?

—আমরা আড়ংঘাটায় আছি, ওখানে বাড়ী করেছি।

—তোমার ছেলেমেয়ে ক'টি ?

—দুই ছেলে এক মেয়ে।

—তোমার মা বেঁচে আছেন তো ?

—না দাদা তিনি বছর পাঁচেক আগে দেহ রেখেছেন।

—তুমি এখানে কী চাকরি কর ?

—না দাদা আমি কোন চাকরি করি না। না জানি ভালো লেখা পড়া, না আছে জানাশোনা, কি করে চাকরি পাব ? আমি আড়ংঘাটার বাজারে চিড়ে-মুড়ির দোকান করেছি। ভগবানের কৃপায় কোন রকমে দিন কেটে যাচ্ছে। গৌরের গলায় তুলসীর মালা, তাকে দেখে মনে হয় সে ধার্মিক লোক।

গৌর একটু চুপ করে থেকে বলল—ভালো কথা বড়দা, আমাদের ওখানে যুগোল-কিশোরের মেলা হচ্ছে। খুব জাগ্রত ঠাকুর। মেলাও বেশ বড় হয়। একমাস ধরে মেলা থাকে। অনেক লোকের সমাগম হয়। চলুন না আপনারা গিয়ে আমার ওখানে থেকে মেলা দেখে আসবেন?

একটু চিন্তা করে হরনাথ বললেন—ওরা কে যাবে না যাবে আমি ঠিক বলতে পারছিনা ভাই, তবে তুমি যদি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও, আমি যেতে রাজী আছি। এক জায়গায় বদ্ধ হয়ে থাকতে আর ভালো লাগছে না।

সেদিন গৌর ফিরে যাবার সময় তার সঙ্গে হরনাথ স্টেশনে গিয়ে রানপুর লোকালে উঠলেন।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় গৌর দরজায় কড়া নাড়তে তার বড় ছেলে মহিম এসে দরজা খুলে দিল। গৌর স্ত্রীকে বলল—দেখ গো কাকে ধরে নিয়ে এসেছি।

মলিনা মাথার ঘোমটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে হরনাথের পায়ের একটু তফাতে মেঝেতে মাথা রেখে প্রনাম করল। ছেলে মেয়েদের উদ্দেশ্তে বলল—তোরাসব প্রনাম কর, তোদের জেঠামশাই হন, দীমু কাকারবড়দাউনি। সকলেই একে একে হরনাথকে প্রনাম করল। মহিম রাত্রে দোকানে থাকে। সে খেতে এসেছিল। খেয়ে দেয়ে দোকানে চলে গেল।

পরেরদিন সকালে হরনাথ ঘুম থেকে উঠে শুনলেন গৌর ভোরবেলায় দোকানে চলে গেছে। এখন মেলা উপলক্ষে খুব সকাল থেকেই দোকানে বিক্রী শুরু হয়ে যায়। বাড়ীতে বাড়তি লোক রাখতে হয়। এই একমাস কোথাও যাওয়া যায়না। দীননাথের চিঠি পেয়ে কিছু টাকা নিয়ে গৌর গতকাল তার কোয়ার্টারে গিয়েছিল। নিতান্ত দায়ে না পড়লে দীননাথ টাকা ধার চাওয়ার লোক নয় গৌর তা ভালো মত জানে। দেশ থেকে এসে প্রথম দিকে স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে গৌর খুবই কষ্টের মধ্যে দিন কাটিয়েছে। সেই দুর্বিপাকের সময় বাল্যবন্ধু দীননাথ যথাসাধ্য নানা ভাবে সাহায্য করেছে। তার এই কারবারের মূলধনও দীননাথই প্রথম জোগাড় করে দিয়েছিল। গৌর অবশ্য ক্রমে ক্রমে তা পরিশোধ করে দিয়েছে। দীননাথের সে উপকার গৌর ভোলেনি। তাই চিঠি পাওয়া মাত্রই সে টাকা নিয়ে কাঁচরাপাড়া ছুটেছিল।

হাত-মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে প্রায় আধমাইল পথ হেঁটে হরনাথ আড়ংঘাটার বাজারে এলেন। চুর্ণী নদীর পাড়ে বেশ জমজমাট বাজার। সপ্তাহে মঙ্গল, বৃহস্পতি, ও শনি এই তিন দিন হাট বসে। এ ছাড়া প্রতিদিন সকাল বিকাল বাজার তো

াছেই। এই অঞ্চলের যাবতীয় তরিতরকারী পেঁপে, কলা, মূলো, আম, জাম, াঠাল, খেজুরে গুড়-পাটালী ইত্যাদি এই হাটের মাধ্যমে কেনা বেচা হয়ে কালকাতা সহ অন্যান্য শহরবাসীদের চাহিদা মেটায়। এই হাটের মধ্যে ীরের ছোট মুড়ি মুড়কি বাতাসার দোকান হলেও বিক্রি-পাটা বেশ ভালোই। াতাসায় সে নাম করে ফেলেছে। বড় দোকান ছেড়ে দূরের খরিদ্দাররা তার াকান থেকে পাইকারী দরে বাতাসা নিয়ে যায়।

হরনাথ কিছুক্ষণ দোকানে বসে গল্প গুজব করে মহিমের ছোট ভাই মুকুন্দকে িয়ে মেলার দিকে গেলেন। চূর্নীর পাড় থেকে শ'দুই আড়াই গজের দূরত্বে ই আঞ্চলের বিখ্যাত যুগোল কিশোর মন্দির। চারদিকে দেয়াল ঘেরা বাড়ীর ধ্যে এই মন্দির। পাথর ও অষ্টধাতুর বিগ্রহের দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে য়, মন প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। হরনাথ চটি খুলে রেখে মন্দিরের বারান্দায় ড়িয়ে দু'চোখ ভরে রাধাকৃষ্ণের যুগোল মূর্তি দেখলেন, তারপর প্রনাম করে মে এসে সম্মুখে বাঁধানো বকুল গাছের তলায় বসলেন। মেলার প্রথম দিক ল এখনও তেমন ভিড় জমেনি। তবে এখানে যে বেশ জমজমাট মেলা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; দোকান পত্রের বাহার দেখেই তা বেশ বোঝা য়। মুকুন্দকে দোকানে যেতে হবে বলে হরনাথ তাকে ছেড়ে দিয়ে নিজে খানে বসে রইলেন।

দিনদুই পরে হরনাথ গৌরকে বললেন—ভাইরে আমাকে একটা যুক্তি বুদ্ধি তে পার?

—কিসের যুক্তি বুদ্ধি দাদা? গৌর হরনাথের দিকে তাকাল। হরনাথ টু ইতস্তত: করে অবশেষে বললেন—তুমি তো জানছ সব, দেশ থেকে এক া আনতে পারিনি, অতগুলো লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে দীনু িম খেয়ে যাচ্ছে। আমি ভাইকে তো জানি, ও মুখ ফুটে কিছু বলবেনা, কিন্তু ার তো বিবেচনা আছে; বল তো কি করে আমি দু'পয়সা রোজগার ওকে সাহায্য করতে পারি?

গৌর বলল—আচ্ছা ঠিক আছে, আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন, দেখি করা যায় কিনা। পরের দিন দুপুরে খাওয়ার পর দোকানে যাবার সময় বলল—দাদা আমার ছোট ছেলে মুকুন্দ মেলায় একটা জায়গা পেয়েছে। বাতাসার সঙ্গে বোঁদে আর জিলিপি ভাজবে ঠিক করেছে। কারিগড় তো ই, আপনি যদি একটু সাহায্য করেন তাহলে ওর মনের ইচ্ছাটা পূরণ হয়।

আপনি শুধু দোকানে বসে থাকবেন। ক্যাশ আগ্‌লাবেন যাতে পয়সা কড়ি কেউ ফাঁকি না দেয়। আপনি না থাকলে ছেলে-ছোকরাকে কেউ পাত্তা দেবেনা, পয়সা মেরে পালাবে।

হরনাথ মনে মনে খুশি হয়ে বললেন—বেশ বেশ এ তো উত্তম কথা, আমি তো বসেই আছি, আর এভাবে সময়ও কাটছে না···

পরদিন গৌর ছোট ছেলে মুকুন্দ ও হরনাথকে মেলার মধ্যে সুকুমার আর গোপাল ঘোষের মিষ্টির দোকানের মাঝখানে পড়ে থাকা এক ফালি জায়গায় কায়দা করে বসিয়ে দিল, এবং দীননাথকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিল, বড়দা এখানে ভালোভাবে আছেন, তোমরা কোন চিন্তা ক'রোনা। তাঁর ফিরতে কিছুদিন দেরি হবে।

৭

মেলা শেষ হলে যেদিন হরনাথ কাঁচরাপাড়া যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন সেইদিন গৌর কাছে এসে বলল—বড়দা মনে কিছু করবেন না, এই টাকাগুলো কাছে রেখে দিন।

হরনাথ তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে গৌর পুনরায় হেসে বলল—এটা আপনার অংশের টাকা। চব্বিশ দিনে খরচ বাদ দিয়ে মোট সাতের শো ছেচল্লিশ টাকা লাভ হয়েছে। আপনার ভাগে পড়ছে ছ'শো টাকা মত। একশো টাকা আমি খাবার বাবদ কেটে নিয়েছি। অতএব আপনার দ্বিধা করার কোন কারন নেই, এটা আপনার উপার্জ্জনের টাকা। আর ভালো কথা, এখানে সাহা বাবুদের পাটের গুদামে আপনার হিসাবের খাতা লেখার একটা কাজ ঠিক হয়ে আছে, আপনি সপ্তাহ খানেক থেকেই আবার এখানে চলে আসবেন। আপাততঃ মাসে ওঁরা দু'শো টাকা মত দেবেন, তবে কাজে সন্তুষ্ট হলে বাড়িয়ে দেবেন কিছু। ওঁরা আমার খুবই জানাশুনা লোকে।

হরনাথ ভেবে চিন্তে খুব ধীরে হাত পেতে পাঁচখানা একশো টাকার নোট হাতে নিয়ে ধুতির খুটে ভালো করে বেঁধে কোমরে গুজে রাখলেন, তারপর হৃষ্ট চিত্তে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গৌরের সঙ্গে ষ্টেশন পর্যন্ত এসে ট্রেনে উঠলেন।

হরনাথ কাঁচরাপাড়ায় এসে শুনলেন। দীননাথের খড়গপুরে বদলির হুকুম হয়েছে। এই চিন্তায় বাড়ীর সকলেই উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। কারণ এখান থেকে দৈনিক খড়্গপুরে যাতায়াত করে অফিস করা সম্ভব নয়। হয় খড়্গপুরে

কান মেস অথবা বাসা করে তাকে আলাদা থাকতে হবে ; নয়ত সেখানে কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করে সকলকে নিয়ে যেতে হবে।

সেইদিন রাত্রেই হরনাথ ও গৌরী শুনতে পেলেন অনেক রাত অবধি দীননাথ আর কমলার মধ্যে অনুচ্চস্বরে বচসা চলছে। দীননাথের বক্তব্য, এমন অবস্থায় সে নিজের জন্য বা কমলার জন্য সেখানে বাসা ভাড়া করতে পারবে না, আপাততঃ সে কোন অফিস মেসে কয়েকটা মাস কাটিয়ে এর মধ্যে কোয়ার্টার বদলি করিয়ে সকলকে সেখানে নিয়ে যাবে। কিন্তু কমলার বক্তব্য, কোয়ার্টার এখানে যেমন আছে থাক, তাকে এবং দুই ছেলেকে নিয়ে দীননাথ খড়্গপুরে বাসা করুক। সেখান থেকে না হয় দীননাথ মাসে মাসে দাদার নামে মনিঅর্ডার করে টাকা পাঠিয়ে দেবে। দীননাথ তাকে বুঝিয়ে পারছেনা যে তার সীমিত রোজগারে ওদিকে সংসার চালিয়ে এদিকে টাকা পাঠানো যাবে না, কিংবা এদিকে সংসার চালিয়ে ওদিকে ব্যয় নির্বাহ করা যাবে না। কমলা বুঝেও যেন বুঝতে চাইছে না। সে বলতে চাইছে সেখানে বাসায় সে কষ্ট করতে ইচ্ছুক, কিন্তু এখানে সে সুখে থাকতেও রাজী নয়। কমলার বক্তব্য যে দীননাথ বুঝতে পারছে না এমন নয়, কিন্তু সে কোনদিকে রাখবে ঠিক করতে পারছে না। কমলা এতদিন কত ত্যাগ স্বীকার করে অবশেষে এমন নির্মম, কঠিন হয়ে উঠতে পারে দীননাথ যেন ভাবতে পারছে না। দাদা ও তার পরিবারের সকলকে তাড়িয়ে দিতে কমলা বলছে না বটে ; কিন্তু যা বলছে পরিনামে একই অর্থ দাঁড়াবে এটা বুঝে নিতে কারও অসুবিধা হবার কথা নয়। মানুষের অনেক দুরাবস্থার জন্য মানুষ নিজে দায়ী ঠিকই কিন্তু সব দুরবস্থার জন্য সে দায়ী নয়, কমলা যেন একথা বুঝে নিতে বা মেনে নিতে চাইছে না।

হরনাথ বুঝলেন কমলার কোন দোষ নেই। প্রবল দারিদ্রতা তাকে এমন পরিবর্তন এনে দিয়েছে। সে অভাব দেখে ভীত হয়ে পড়েছে। তার স্বামীকে অবশ্যম্ভাবী দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্যই এমন কঠিন প্রকৃতি ধারন করেছে। হরনাথ মনে মনে নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিলেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখতে চান ঝড়ের মধ্যে বাহির-ঘর হলে ঝড় তাঁকে আছড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলে, না নতুন করে জীবন-ভিত গড়ে তোলে ?

পরদিন সকালে স্নান খাওয়া সেরে দীননাথ যখন অফিসে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে তখন হরনাথ তার কাছে গিয়ে বললেন—তোকে কবে খড়্গপুরে জয়েন করতে হবে ?

—আগামী সোমবারে, মাঝে পাঁচদিন সময় আছে। আমি একমাসের সময় চেয়ে দরখাস্ত করেছি। দীননাথ জুতোর ফিতেয় গিঁট দিয়ে মাথা নিচু করে রইল।

হরনাথ বললেন—আর তোর দেরি করে কাজ নেই। তুই বরং আসছে এই সোমবারেই জয়েন করে ভাখ ওখানে কোয়ার্টার পাস কিনা; আর তা না পেলে আপাততঃ বাসা করে বৌমা ও ছেলেদের সেখানে নিয়ে যা···

দীননাথ মুখ তুলে বলল—না না সে কি করে হয়? আমি তুদিকে চালাব কি করে? তা ছাড়া তোমাদের এখানে রেখে···

—আমাদের কথা আর ভাবতে হবে না। একটা কথা তোকে বলা হয়নি, গৌর আড়ংঘাটায় পাটের আড়তে আমার একটা কাজ জোগাড় করে দিয়েছে, এবার গিয়ে সেখানে কাজে লাগতে হবে।

—সে তুমি কি করে পারবে? পাটের ধুলো তোমার নাকে মুখে গিয়ে শরীর খারাপ করবে, শেষ পর্যন্ত যক্ষাও হতে পারে, আর তা ছাড়া সেখানে ক'টাকা তোমাকে দেবে তারা?

—আপাততঃ নাকি শ'তুয়েক দেবে, পরে কাজ দেখে বেশিও দিতে পারে। তাছাড়া আমাকে তো কিছু করতে হবে? তুই সকলের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে হাবুডুবু খেয়ে মরছিস এ আমি কেমন করে দেখি বল? তুই কোন চিন্তা করিসনে, এর থেকে আস্তে আস্তে আমি অন্য কিছু ঠিক জোগাড় করে নেব; মানুষ একডাল ধরেই অন্যডালে পা দেয়। আর একটা কথা, আমি এতদিন ওখানে গিয়ে মেলায় কিছু কাজ করেছিলাম, আমি কিছু টাকা আয় করেছি। এই তুশো টাকা তোর পকেটে রাখ, যাবার জন্য কেনা কাটা কিছু করতে হলে করিস।

দীননাথ আপত্তি করে বলল—না না আমাকে দিতে হবে না, তুমি নিজের কাছেই রেখে দাও, লাগলে তুমিই খরচ ক'রো।

—আমার কাছে আরো কিছু টাকা আছে। তুই এটা ধর, নিজে হাতে খরচ করবি! হরনাথ জোর করে দীননাথের মুঠোর মধ্যে টাকাগুলো গুঁজে দিলেন।

দীননাথের যাত্রার দিন হরনাথ স্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে গিয়ে ভাইকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এলেন। ফেরার পথে স্টেশন বাজার থেকে বাকী তিনশো টাকার একশো টাকা খরচ করে কমলার জন্য শাড়ী ও ছেলেদের জন্য তুটো জামা

কিনে নিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে এলেন। প্রথমে কমলা এই সব দেখে ক্ষুব্ধ হলেও পরে হরনাথের কথায় সে স্বাভাবিক না হয়ে পারল না।

হরনাথ বলেছেন—বৌমা তুমি মনে ক'রোনা আমি রাগ করে বা প্রতিদান স্বরূপ এই সব করলাম। সংসারে যার যখন দায়িত্ব আসে, সে তখন সাধ্যমত বা সাধ্যাতিরিক্ত বহন করে; মানুষ মাত্রেই এই ভূমিকা পালন করতে হয়। ভগবান পর্যায়ক্রমে এক একজনকে দিয়ে এই দায়িত্বের বোঝা বহন করিয়ে নেন। যে এই দায়িত্ব পালন করে না সে ভাগ্যবান ব্যক্তি তো নয়ই বরং ভগবানের বিচারে সে অতিশয় দীন হীন ও তুচ্ছ ব্যক্তি—তা সে যতই আর্থিক সম্পদের অধিকারী হউক, আর শিক্ষা দীক্ষায় বড হইক। মানুষ আজ আছে কাল নেই। কর্তব্য পালনের সৌভাগ্য সকলের হয়না বৌমা! জানিনা এ জীবনে আর দেখা হবে কিনা; এই কাপডখানা যদি তুমি খুশি মনে পর, তাহলে আমার খুব আনন্দ হবে।

ভাসুরের কথায় কমলার জ্ঞান চক্ষু খুলে গেছে! তার মনে পডল সে দীননাথের মুখে শুনেছে, ছোটবেলায় তাদের বাবা মা মারা গেলে এই ভাসুর দিদির সাহায্যে কেমন কষ্ট করে দীননাথকে বড় করে তুলেছেন, দূরের স্কুল বোর্ডিংএর খরচ চালিয়ে তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন। তা নাহলে আজ দীননাথ কেমন করে এই রেলের অফিসের একাউন্টস ক্লার্ক হবার উপযুক্ত হত? আর তার সঙ্গে কমলার বিয়েই বা কেমন করে হত? ছি-ছি-ছি! আত্মসুখ দেখতে গিয়ে সে কত বড অন্যায় করতে বসেছিল? যাক্ জগদীশ্বর তাকে রক্ষা করেছেন; তিনি সবদিক রেখেছেন।

পরেরদিন যাত্রার সময় কমলা হরনাথের দেওয়া শাড়ীখানা পরিপাটি করে পরে এসে মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করে বলল—বড়দা আপনার পায়ে পড়ি আমাকে আপনার মেয়ে মনে করে ক্ষমা করবেন, জীবনে আমি আর ভুল ক'রবনা।

সে গৌরীর হাত জড়িয়ে ধরে বলল—দিদি ছোট বোনকে ক্ষমা ক'রো, এখানে অনেক কষ্ট পেয়ে গেলে, ভগবান যেন তোমাদের কষ্টের অবসান করেন। আর বড়দিকে, গোপাকে আমি এখন ছাড়ছি না; তোমরা ওখানে গিয়ে স্থিতি হয়ে বাস কর, তারপর ওদেরকে নিয়ে যেও।

গৌরী রিক্সায় বসে বলল—ছোট বউ তোরা কোয়ার্টার পাল্টে চিঠি দিস;

আর দুটিতে ঝগড়াঝাটি করিসনে যেন। আমাদের জন্য কোন চিন্তা করিসনে ভগবান আমাদের ঠিকই চালিয়ে নেবেন।

৮

আড়তের মালিক পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার অধিবাসী ছিলেন। ভক্তি পরায়ন ব্যক্তি। সব সময় বিজয় বাবু গদিতে বসে মালা জপ করেন। হরিপদ, বঙ্কু আর ভজহরি তিন ছেলের পাশাপাশি কারবার। তিনি মেজ ছেলে বঙ্কুবিহারীর অধীন। হরনাথ এই বঙ্কুবিহারীর আড়তে নিয়োজিত হয়েছেন। মাস দুই কাজ করার পর তাঁর মাইনা তিরিশ টাকা বেড়েছে।

গৌরের বাড়ীতে চারখানা ঘর। হরনাথকে সে বিনাভাড়ায় একখান ছেড়ে দিয়েছে। শিবানী আর গৌরী ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে ঠোঙা বাঁধে। মহিম সেই ঠোঙা নিজের দোকানের জন্য কিছু কিনে নিয়ে বেশিগুলো অন্য দোকানে বিক্রী করে পয়সা এনে গৌরীকে দেয়। গৌরী হরনাথের দু'শো তিরিশ টাকা আর ঠোঙা বিক্রীর টাকায় সংসারের খরচ একভাবে চালিয়ে নেন। দীননাথ প্রথম মাসে একশো ও দ্বিতীয় মাসে ষাট টাকা পাঠিয়েছিল। কিন্তু গৌরীর পরামর্শে হরনাথ কড়া করে চিঠি লিখে মনিঅর্ডারে টাকা আসা বন্ধ করে দিয়েছেন।

মাস আটেক পরে একদিন রাত্রিবেলা গৌর বলল—বড়দা আপনাকে জিজ্ঞেস না করে একটা কাজ করে ফেলেছি ; স্টেশন রোডে অন্নপূর্ণা হোটেলটা বিক্রী হ[illegible] রামেশ্বর পাঁড়ের হাতে চলে যাচ্ছিল, আমি সেটা একহাজার টাকা বেশি দামে বায়না করে ফেলেছি। আপনি যদি রাজি থাকেন তাহলে মহিমকে আপনার হাতে ছেড়ে দিই, আপনারা দুই জ্যাঠা-ভাইপোতে মিলে চালাবেন। না হলে আমাকে আবার বিক্রী করে দিতে হয়…

হরনাথ হেসে বললেন—তুমি তো আমার ভালোর জন্যই বলছ, কিন্তু আমি নেব কি দিয়ে? টাকা পাব কোথায়?

—আপনার এতে কোন টাকা লাগবেনা, আপনি শুধু ভালোভাবে যাতে চালানো যায় তাই দেখবেন। খুব চালু হোটেল ছিল। ছোট হলেও বিক্রী বেশ ভালোই হত। মালিকের অবর্তমানে তার ছেলেরা যে যখন বসে সে-ই টাকা চুরি করে উজার করে দিচ্ছিল বলে মালিকের বউ বিরক্ত হয়ে বিক্রী করে দিচ্ছে। যা লাভ হবে ছয় আনা লভ্যাংশ আপনি পাবেন, ছয় আনা মহিম পাবে।

আর বাকী চার আনা আমার মূলধন বাবদ আমি নেব। মূলধন সুদ সহ ফেরৎ হয়ে গেলে আপনারা দুজন আট আনা হিসাবে সমান অংশ পাবেন।

পরের সপ্তাহে গনেশ পুজোর মাধ্যমে হরনাথ মহিমের সঙ্গে হোটেলের গদিতে গিয়ে বসলেন। এবং কয়েকমাস কাটতে না কাটতে হোটেল আবার প্রসিদ্ধি অর্জন করে বিক্রী বেড়ে গেল। হরনাথ বুঝলেন, মা লক্ষ্মী তাঁর সহায় হয়েছেন। বছর দুই এর মধ্যেই হরনাথ গৌরের প্রচেষ্টায় খালের ধারে দুই কাঠা জমি কিনে তাতে টালির ঘর উঠাতে সক্ষম হলেন। গোপাকে আনিয়ে তাকে আর শিবানীকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন।

কয়েকটা বছর পরের কথা। গোপা স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। হরনাথ দেখলেন এদেশে মেয়েরা অনেক বড় হয়েও লেখা পড়া করে। তিনি মেয়েকে রানাঘাট কলেজে ভর্তি করে দিলেন। পরের বছর শিবানীও স্কুল ফাইনাল পাশ করে গেল। এবার গৌরী মেয়েদের বিয়ের জন্য হরনাথকে চাপ দিতে থাকলেন। হরনাথ ভাই দীননাথকে সম্বন্ধ দেখার জন্য চিঠি লিখলেন। এদিকে নিজে ও গৌর দুজনেই চেষ্টা করতে লাগলেন।

বি-এ পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিয়ে ফেরার সময় একদিন গোপা দেখল তার সহপাঠিনীরা প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে কি একটা কাগজ মনোযোগ সহকারে দেখছে। সে কাছে গিয়ে দেখল নার্সিং ট্রেনিংএর ফরম। তাদের সঙ্গে সেও একটা ফরম কিনে সেটা পূরণ করে ডাকের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিল। এর মাস ছয়-সাত পরে সে ইন্টারভিউ এর ডাক পেল। বান্ধবীদের সঙ্গে গিয়ে সে ইন্টারভিউ দিয়ে এল। বি-এ পার্ট টু পরীক্ষার কিছুদিন পরেই তার নার্সিংএ ভর্তির জন্য ডাক এল। তার বাবা মা এই সকল বৃত্তান্ত জেনে মর্মাহত হলেন; কারণ তাঁদের মনের ইচ্ছা নয় গোপা বাড়ী ছেড়ে গিয়ে এই চাকরি করুক। বিশেষতঃ তাঁরা এখন তার জন্য বিয়ের সম্বন্ধ দেখছেন। গোপা কোন উপায় না দেখে গৌর কাকার শরণাপন্ন হল, গৌর কাকা এসে তার বাবা-মাকে বলতেই কাজ হল। নির্দিষ্ট দিনে বাবামায়ের আশীর্বাদ নিয়ে গোপা বাড়ী থেকে কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজে যাত্রা করল। তার সঙ্গে আরো দুটো মেয়েও ট্রেনিং নিতে যাচ্ছে। হরনাথ সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু সঙ্গে বান্ধবীরা থাকায় গোপা আর বাবাকে অযথা কষ্ট দিল না।

প্রায় একবছর পরে গোপা আশ্বিন মাসে দুর্গাপুজার সময় সাত দিনের ছুটি

পেয়েছে। ট্রেনিংকালীন ভাতা হিসাবে সে এতদিন ধরে যে টাকা পেয়েছে তা থেকে নিজের খরচ চালিয়ে সে বাক্সে বাকী টাকা জমিয়ে রেখেছে। একবার বাবা দেখা করতে এলে গোপা টাকা দিতে গেলে হরনাথ বলেছিলেন—মা তুমি উপায় করছ—বিদেশে আছ, তুমিই কাছে রেখে দাও, ইচ্ছা মত খরচ ক'রো। না হয় জমিয়ে রেখ, দরকার হলে পরে চেয়ে নিয়ে যাব!

তারপর গোপা আর টাকা পয়সা বাড়ীতে পাঠায়নি। এখন সে দেখল বাক্সে অনেকগুলো টাকাই জমেছে। সে জানতে পারল আগামীকাল দুপুরের পরে কেতকীরা হাতীবাগানে পুজোর কেনা-কাটায় বেরোবে। সে শোবার আগে লিস্ট করে রাখল কার কার জন্য কি কি কিনতে হবে।

ছুটির দিন সকাল বেলা গোপা সুটকেস নিয়ে ট্রামে উঠে হাওড়ায় গেল। আগে সে খড়্গপুর যাবে, তারপর সেখান থেকে আড়ংঘাটা যাবে। না হলে আড়ংঘাটা থেকে কোলকাতা হয়ে খড়্গপুর গিয়ে আবার তাকে আড়ংঘাটায় ফিরতে হয়। কাকার কোয়ার্টারে পৌছুতে তার ন'টা বেজে গেল। তাকে দেখে সকলেই আনন্দিত হল। গোপা ব্রজবালাকে প্রনাম করল। তার কাকা এসময় অফিসে।

কমলা বলল—এ কি করেছিস তুই? টাকা পেলি কোথায় যে এত সব কিনতে গেলি?

গোপা মৃদু হেসে বলল—তোমার বাক্স থেকে চুরি করেছি, সে কাকীমার গায়ে ঢলে পড়ল।

কমলা বাচ্চা মেয়ের মত গোপাকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল—আমার বাক্সে থাকলে তো নিবি? খাওয়া দাওয়া সব বন্ধ করে এইসব করার জন্ত টাকা জমিয়ে গেছিস, তোর চেহারাই তার প্রমাণ দিচ্ছে।

গোপা বলে ওঠে—কেন কাকী আমি কি খুব রোগা হয়ে গেছি? আচ্ছা এর থেকে বেশি মোটা হলে কি ভালো হত?

—তা জানিনে বাছা! তবে ও বয়সে আমার চেহারা তোর থেকে মোটা ছিল তাই বলতে পারি। নে এখন ওঠ, বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধো, কাপড় ছাড়, আমার জল খাবার তৈরিই আছে।

গোপা বাথরুম থেকে কাপড়-চোপর বদলে এসে সন্তুকে জোর করে কোলে বসিয়ে দুজনে জল খাবার পেল। তারপর সকলের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। তার ট্রেনিং জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথাই তার মধ্যে বেশি। দুপুর বেলা

দীননাথ খেতে কোয়ার্টারে আসেন। গোপাকে দেখে তিনি খুবই খুশি হয়েছেন। গোপা জানতে পারল তার বাবা কাকাকে চিঠি দিয়েছেন। পুজোর মধ্যে অবশ্যই সকলকে আড়ংঘাটায় যেতে লিখেছেন। কাকা সপ্তমীর দিন এখান থেকে যাবার মনস্থ করেছেন।

পরের দিন গোপা পিসিমা ও দুই ভাইকে নিয়ে আড়ংঘাটা রওনা হল। কাকা ও কাকীমা দুদিন পরে যাবেন। আড়ংঘাটা পৌছতে প্রায় বিকাল হয়ে গেল। ষ্টেশন থেকে রিক্সায় প্রথমে হোটেলে এসে গোপা বাবার সঙ্গে দেখা করল, তারপর সকলকে নিয়ে বাড়ীতে গেল। ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম করে সে দু'ভাইকে সঙ্গে করে মলিনা কাকীমার বাড়ীতে গেল।

গোপাকে দেখে তিনি খুবই আনন্দিত হলেন। কাপড়-চোপড় দেখে বললেন—এ কি করেছিস মা তুই? কাকাকে দিয়েছিস তাতেই যথেষ্ট, আবার আমাকে কেন রে?

গোপা মুখ নিচু করে উত্তর দিল—সব সময় তো করি না, সুযোগ পেয়েছি. নিজের পয়সা খরচ করে একটু আনন্দ ক'রলাম! তাতে আপনার রাগ কেন?

—দ্যাখো মেয়ের কথা! মলিনা আদর করে গোপার চিবুক টিপে ধরলেন। তারপর তিনি তাদের জন্য জলখাবারের ব্যবস্থা করতে তৎপর হলেন।

খবর পেয়ে গৌর এক হাঁড়ি মিষ্টি আর একটা ইলিশ মাছ নিয়ে বাড়ীতে ঢুকতে ঢুকতে বললেন—কই আমার মা কোথায়? এতদিনে ছেলের কথা মনে পড়ল বুঝি?

—গোপা পায়ের ধুলো নিয়ে বলল—এই সবে ছুটি পেয়েছি, কাকা আপনার শরীর ভালো আছে তো?

—এই মা আছি এক রকম। রাত্রিবেলা মাঝে মাঝে কাশিতে একটু কষ্ট পাই। ডাক্তারী ওষুধ খাচ্ছি, কিন্তু তেমন ফল পাচ্ছিনা। কোলকাতার কলেজ ষ্ট্রীট সাধনা ফার্মেসী থেকে আমার জন্য কৌটো দুই চ্যবনপ্রাশ এনে দিতে পার? শুনেছি ওখানের ওষুধে নাকি ভালো কাজ হয়। তাই ভাবছি দিন কতক খেয়ে দেখলে হ'ত কোন উপকার হয় কিনা!

—আচ্ছা কাকা আমি গিয়ে কিনে পাঠিয়ে দেব। ও কি করছেন? এখন টাকা দিতে হবে না, পরে দেবেন। আর আপনার আশীর্বাদে আমি তো এখন বেকার নই, ও কটা টাকা আমার ঠিক যোগাড় হয়ে যাবে ই……

—আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে ; তুমি এখন এ গুলো মুখে পোরো তো ? শুনলাম দীনুর ছেলেরা এসেছে, তারা কোথায় ?

—তারা মুকুন্দকে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে গেছে।

গৌর স্ত্রীর উদ্দেশে বললেন—ওগো তাড়াতাড়ি রান্না কর, মা জননী খেয়ে যাবে ; আমি বড়দাকে খবর দিয়ে এসেছি।

—না না কাকা আজ নয়, আর একদিন হবে। গোপা আপত্তি জানায়।

—সে কি হয় মা ? আমি তোমার নাম করে মাছ নিয়ে এসেছি, আর দীনুর ছেলেরাও এসেছে, ওরা তো কোনদিন আসে না !

—বেশি দেরি হবে না মা, আমি এক্ষুনি রেঁধে দিচ্ছি। মলিনা স্বামীর সঙ্গে যোগ দিয়ে বলে ওঠেন। তিনি আরও বলেন—দ্যাখো মেয়েটা কি-করেছে ! তোমার ধুতি পাঞ্জাবী ছাড়াও আমার জন্য আবার শাড়ী এনেছে…

—এত সব কি দরকার ছিল মা ? আর তাছাড়া আমার সময়ই বা কোথায় ? এই দ্যাখোনা বাধ্য হয়ে ফতুয়া ধরেছি !

গোপা মুখ নিচু করে বলল—যখন অবসর পাবেন তখনই পরবেন।

—আর আমার অবসর ! গৌর কাঁচা-পাকা দাড়িতে হাত বোলাতে থাকেন। তারপর চলতে চলতে বলেন—আমি দোকানে যাচ্ছি মা, তোমরা কিন্তু না খেয়ে যেয়োনা, তাহলে তোমার বুড়ো ছেলে বড়ই কষ্ট পাবে।

রাত্রিবেলা খাওয়া দাওয়ার পর মুকুন্দ সঙ্গে গিয়ে গোপাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এল।

ষষ্ঠীর দিন বিকাল বেলা দীননাথ কমলাকে নিয়ে আড়ংঘাটা নামলেন। গোপা শিবানী, মান্তু আর সন্তুকে নিয়ে কাকা ও কাকীমার জন্য অপেক্ষা করছিল। দশ মিনিটের হাঁটাপথে সকলে স্টেশনের পিছন দিক দিয়ে হেঁটে গিয়ে বাড়ীতে পৌঁছুল।

প্রতিবছর এই দুর্গা পূজার সময় গোপার দেশের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে ছোট বেলায় যাত্রা শোনার কথা। মনে পড়ে হারিয়ে যাওয়া মানুষ-গুলোর কথা। বিশেষ একখানা মুখ স্মরণ করতে তার খুবই ভালো লাগে ; সেই সঙ্গে বুকের ভিতরটা কেমন করে ওঠে। ছোট বেলায় যে সব কথা সে বুঝতে পারত না, এখন তার কাছে সে সব অতি প্রাঞ্জল। নার্সের ট্রেনিংএ

থাকা কালীন নারী-পুরুষের দেহ রহস্যের অনেক কিছুই সে এখন জানতে পেরেছে। জেনেছে তার সহপাঠিনী নার্সদের প্রণয় কাহিনী ও প্রেমিকদের কথা।

তার দেহ-যমুনা এখন কানায় কানায় পূর্ণ। বুঝিবা প্লাবণ উন্মুখ। মাঝে মাঝে উছলে উঠতে চায়। সাধ হয় কোন মনের মাঝি নৌকার হাল ধরে যৌবনের গান শোনাক। প্রকৃতি অলক্ষ্যে তার বাগানে যে সকল কুসুম ফুটিয়েছে তাদেরকে আঘ্রাণ করুক; গোপন সিন্দুকের চাবি খুলে অমৃত পান করুক। বলতে দ্বিধা নেই মনের দোসর হতে যার মুখ স্মরনে আসে সে হ'ল বাল্য ও কৈশরের সেই অতি পরিচিত জন গোকুল। কিন্তু সে আজ কোথায়? কেমন আছে সে? সে কি তার কথা আজও মনে রেখেছে? গোপার চক্ষু জলে ভরে ওঠে। ঘুম আসে না। সে বিছানায় উঠে বসে। মৃদু আলোয় দেয়ালে বাংশীধারী কৃষ্ণের মোহন মূর্তি চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর একসময় জোর করে পাশ-বালিশ চেপে ধরে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে।

ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙল তখন তার মনে হ'ল, শয্যায় সে একা ছিল না। তার ইপ্সিত পুরুষ গোকুল এসে প্রহরে প্রহরে তার দেহ বীণার সকল তন্ত্রীতে সুরের ঝঙ্কার তুলে তাকে তৃপ্ত করে এই মাত্র বোধ হয় ফিরে গেছে। তার সমস্ত দেহে-মনে তৃপ্তির প্রশান্তিতে ভরে আছে।

আজ অষ্টমী। গোপা কাকার দেওয়া শাড়ীখানা পরে কাকীমা ও পিসিমার সঙ্গে অঞ্জলি দিতে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখল তাদের বাড়ীতে কয়েকজন অতিথি এসেছে। তাদের ইতস্তত: কৌতূহলি চাহনি দেখে গোপা অনুমান করে নিল বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। হঠাৎ তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কাল রাত থেকে এখন পর্যন্ত সে যে মানসিকতায় বিভোর হয়ে ছিল তাতে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল।

কিছুক্ষণ পরে তার মা গৌরী দেবী এসে বললেন—মা তো মা ওই ঘরে এই খাবারের থালাগুলো দিয়ে আয়।

গোপা কাকীমাকে বলল—তুমি যাও না কাকীমা!

কমলা হেসে বলল—চল আমি তোর সঙ্গে যাচ্ছি।

অগত্যা কাকীমার সঙ্গে গোপাকে যেতে হল। দ্বিতীয়বার যখন সে চায়ের ট্রে রাখতে এল তখন দীননাথ বললেন—গোপা এই চেয়ারটায় একটু ব'স তো।

পালানোর কোন পথ না পেয়ে গোপা চেয়ারটার বসতে বাধ্য হ'ল। সে মুখ নিচু করে ঘামতে থাকল।

পাত্রের মামা হরিমোহন বাবু আপাদমস্তকে কিছুক্ষণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে গোপাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম কি মা?

গোপা নিচু স্বরে উচ্চারন করল "গোপা"।

হরনাথ বললেন—ভালোভাবে বল।

গোপা দ্বিতীয়বার উচ্চারন করল "কুমারী গোপা মিত্র"।

—তোমার বাবার নাম কি?

—শ্রীযুক্ত হরনাথ মিত্র।

—কতদূর পড়াশুনা করেছ?

—বি. এ. পাশ করেছি।

—কতদিন চাকরি করছ?

—চাকরি নয় নার্সিং ট্রেনিংএ আছি, একবছর হ'ল।

—ওই হল, তা এত চাকরি থাকতে এই নার্সিং এ গেলে কেন?

—কেন তা জানিনা, বান্ধবীদের দেখাদেখি দরখাস্ত করে চান্স পেয়েগেলাম তাই করছি।

—এই চাকরিই কি বরাবর করবে?

—তা বলতে পারি না।

—অনেক মেয়েরা বিয়ের পরে চাকরি ছেড়ে দেয়, এ সম্বন্ধে তোমার কি অভিমত?

—এ বিষয়েও কিছু বলতে পারিনা, কারণ মানুষ পরিস্থিতির দাস; কখন কি করবে, আর কি করবে না তা আগে থাকতে বলা যায়না। অনেক মেয়েরা বিয়ের পরে যেমন চাকরী ছাড়ে, তেমনি অনেকে বিয়ের পরে চাকরি নেয় ও।

ভদ্রলোক পুনরায় বললেন—তোমার বিয়ে হ'লে যদি চাকরির প্রয়োজন না থাকে, আর তোমাকে ছাড়তে বলা হয়—তাহলে তুমি কি করবে?

—সেটা বিয়ের পরের কথা, এখন কিছু বলতে পারব না ...

—ওহ্ আচ্ছা। ভদ্রলোক পকেট থেকে নোটবুক বের করে কলমটা এগিয়ে

দিয়ে বললেন—তোমার নাম দিয়ে এখানকার পুরো ঠিকানাটা একটু চট করে এখানে লিখে দাও।

গোপা বুঝল ভদ্রলোক হাতের লেখা যাচাই করতে চান। মনে মনে তার খুব রাগ হ'ল। সে যদি ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়ত তাহলে এর একটা যৌক্তিকতা ছিল। সে বলল—এখানকার ঠিকানা আপনারা জানেন না? তাহলে এলেন কি করে?

ভদ্রলোক এর কোন জবাব দিতে পারলেন না।

দীননাথ গোপার দিকে তাকিয়ে ইশারা করতে গোপা মুখ বুজে খচ খচ নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়ল। চলে যাবার সময় তার নজরে পড়ল কোণে বসা ছেলেটি লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। এ দৃষ্টি তার মোটেই ভালো লাগল না।

ভদ্রলোকেরা ব্যারাকপুর থেকে এসেছিলেন। ছেলেটি শিয়ালদায় রেলের কেরানী। তাঁরা দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে তিনটের ট্রেনে চলে গেলেন।

পূজার ক'দিন সকলে একসঙ্গে আনন্দে কাটিয়ে দীননাথ সকলকে নিয়ে খড়্গপুরে ফিরে গেলেন। তার দু'দিন পরে গোপা সকলের কাছে বিদায় নিয়ে হোস্টেলে ফিরে গেল। ব্রজবালা আড়ংঘাটা রয়ে গেলেন। হরনাথ নিঃসন্তান বিধবা দিদিকে এবার নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন।

কালীপূজার সপ্তাহ খানেক পরে একদিন সাপ্তাহিক ছুটির দিনে দীননাথ গোপার হোস্টেলে এলেন। খবর পেয়ে গোপা এসে কাকাকে ভিজিটর্স রুমে বসিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি চান সেরে নিল। তারপর কাকার সঙ্গে পথে বেরিয়ে এসে কলেজষ্ট্রীট সাধনা ঔষধালয়ের দিকে হাঁটতে লাগল। এ কথা সে কথার পর দীননাথ বললেন—দাদা চিঠি লিখেছেন, তোকে ওদের পছন্দ হয়েছে, কিন্তু তোর কাছ থেকে কোন অভিমত না পেলে আমরা কথা দিতে পারছিনা।

গোপা কিছুক্ষণ নীরব থেকে অবশেষে বলল—কাকা আমাকে ক্ষমা করবেন, এখন আমার বিয়েতে মত নেই। প্রথমতঃ ট্রেনিং চলা কালে বিয়ে করার নিয়ম নেই—আমার ট্রেনিং শেষ হতে প্রায় দু'বছর দেরি আছে, একবারে পাশ করতে না পারলে আরো দেরি হতে পারে। এ ভাবে কোন কাজ বাধিয়ে রাখা ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত: আমার বিয়ে করার মোটেই ইচ্ছা নেই। সেই জন্যই

আমি এই চাকরি বেছে নিয়েছি। আপনারা বরং শিবানীর বিয়ের ব্যবস্থা করুন।

—তবে কি তোর পছন্দ নয়?

—আমার পছন্দ বা অপছন্দের কোন প্রশ্নই আসছে না, আমার যা মনের কথা তা-ই আপনাকে বললাম।

দীননাথ বললেন—তুই মেয়ে সন্তান বিয়ে না করলে কি চলে? বাবা মা তো চির দিন থাকবে না রে! তাছাড়া আমাদেরও তো একটা কর্তব্য আছে?

গোপা বলল—আপনার কথা ঠিকই, কিন্তু আমি সত্যিই বলছি কাকা, আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়, না হলে আপনাদের সকলকে দুঃখ দেওয়া আমার অভিপ্রায় নয়।

দীননাথ বললেন—তুই যদি কারণটা বলিস তাহলে আমি বুঝে দেখতে পারি।

—এর মধ্যে কারণ বা অকারণ কিছুই নেই কাকা, তবুও বলছি আমি এখন বিয়ে করতে পারব না।

অনেক বাদানুবাদের পর দীননাথ ফিরে গেলেন এবং দাদাকে চিঠি লিখলেন।

হরনাথ সেই মত রসিক বাবুকে পত্র লিখলেন "মহাশয়, আমার জ্যেষ্ঠ কন্যার ট্রেনিং আরও দুই বৎসর কিংবা ততোধিক কাল পর্যন্ত চলিবে। ট্রেনিং চলা কালে বিবাহ করার নিয়ম নাই। অতএব আমাদের ইচ্ছা থাকিলেও বর্তমানে তাহার বিবাহের কথা ভাবিতে পারিতেছিনা। পক্ষান্তরে প্রস্তাব রাখি যে আমার কনিষ্ঠ কন্যাটিও বিবাহযোগ্যা এবং আপনারা ওইদিনে তাহাকেও দেখিয়াছেন। যদি আপনাদের মনঃপূত হয়, তবে তাহার সহিতই আপনার ভাগিনেয়কে বিবাহ দিয়া এই কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দায় লাঘব করিবার অনুরোধ করিতেছি"।

পত্রের জবাব পেতে কয়েক মাস দেরি হলেও শুভ সংবাদ এল। পাত্রপক্ষ রাজী হয়েছেন। যথা সময়ে ভগবন্ প্রজাপতির নির্বন্ধ অনুসারে শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে বিবাহকার্য নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে গেল।

৯

গোকুল ম্যাট্রিক পাশ করার পর যশোর কলেজ হোস্টেলে থেকে বিএ পাশ করল। এরপর সে এম-এ পড়ার জন্য ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হল। কয়েক মাস ক্লাস করার পরে একদিন খবরের কাগজে দেখতে পেল ঢাকার আওয়ামী লীগের

নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হয়েছে। পার্টির নেতৃত্ব দিচ্ছেন শেখ মুজিবর রহমান। দীর্ঘকাল পাকিস্থান সরকারের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে তারা জেহাদ ঘোষণা করেছে। তাদের উদ্দেশ্য স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন। কিছুদিনের মধ্যে আন্দোলনকারীরা মুক্তিবাহিনী নামে পরিচিতি লাভ করে সারা বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সোচ্চার হয়ে উঠল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙালী এই আন্দোলনকে স্বাগতঃ জানাল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্থানী সরকার দখল কায়েম রাখার জন্য আরও জঙ্গী হয়ে উঠল। শুরু হ'ল মুক্তিবাহিনী ভেঙে দেবার নানা রকম চক্রান্ত। সরকার তাতে ব্যর্থ হয়ে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। পশ্চিমী খান সেনাদের লেলিয়ে দেওয়া হল, যে করেই হোক আন্দোলন স্তব্ধ করতে হবে। রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে তারা পূর্ববঙ্গের বাঙালীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল বাঙালী নিধন যজ্ঞ। সেই সঙ্গে চলল বাঙালী হিন্দু মুসলমান মা বোনেদের উপর বলাৎকার। তাদের সেই লালসা থেকে রেহাই পেল না এমনকি আশি বছরের বৃদ্ধা কিংবা পাঁচ বছরের শিশু কন্যা পর্যন্ত। মুক্তিবাহিনী প্রথমে ভাবতে পারেনি জনদরদী ভুট্টোর পবিত্র সেনা (পাক ফৌজ) এত জঘন্য, নাচ, পাশবিক অত্যাচারে লিপ্ত হতে পারে। কিন্তু যখন তা হচ্ছে তখন তার প্রতিকার করতেই হবে! শেখ মুজিব সকল বাঙালীকে আহ্বান জানালেন অত্যাচারের মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসার জন্য। এবার সাড়া দিয়ে তারাও সহিংস হয়ে উঠল। কিন্তু মুস্কিল হ'ল মা—.বান, শিশু-বৃদ্ধ বৃদ্ধা যারা আন্দোলন বা পাল্টা আক্রমনে অংশ নিতে পাবেনা তাদের নিয়ে। তাদেরকে মাঝখানে রেখে তো যুদ্ধ করা যায়না! অথচ গোটা পূর্বপাকিস্থানই এখন সমর অঙ্গন! ভীত নরনারী একটুখানি আশ্রয়ের জন্য ভারতের দিকে এগিয়ে চলল। ভারত সরকাব সহানুভূতিশীল হয়ে বিপন্ন পূর্ব পাকিস্থানীদের অনুপ্রবেশ শুধু খুশি মনে মেনেই নেয়নি, তাদের আহার, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য বহু জায়গায় ত্রান শিবির খুলে দিয়েছে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সেখানে আশ্রয় পাচ্ছে।

গোকুলের ইউনিভার্সিটি বন্ধ হয়ে গেছে। সে গ্রামে গিয়ে শুনল তার মামারা এসে বাবা মাকে নিয়ে গেছে। তাদের গ্রামের হিন্দু মুলসমান অনেকেই ভারতে চলে গেছে। গোকুল মামা বাড়ীতে এসে দেখল সেখানেও কেউ নেই। একটা রাত্রি নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে একা একা মামাবাড়িতে কাটিয়ে সে পরের দিন অনেক ঘোরা পথে হোস্টেলে পৌছুল। এখন হোস্টেলে

মাত্র গোটা তিনেক ছাত্র রয়েছে। বাকী সকলের কেউ মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে গেছে কিংবা আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে ভারতে চলে গেছে।

তাকে খলিদ বলল—তুমি যেদিন যাও তার পরেরদিন তোমার মামা এসে এই চিঠিখানা দিয়ে গেছেন। তিনি সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন।

গোকুল চিঠিখানা খুলে পড়লঃ—প্রিয় গোকুল, আমি তোরে নিতি আসছিলাম, কিন্তু দেখা হল না, তোর বাবা মা আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা সকলে ইণ্ডিয়ায় চল্লাম। তুই আজই চুয়োডাঙ্গা শান্তি হোটেলে চলে আসবি। আর যদি খুঁজে না পাস তাহলে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করিস, আমাদের খোঁজ-খবর পাবি।

শ্রীযুক্ত দীননাথ মিত্র।
কোয়ার্টার নং ২০৪/সি,
টাইপ—টু
কাঁচরা পাড়া রেলওয়ে কলোনী,
২৪পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ইণ্ডিয়া।

—আরে এ তো গোপার কাকার ঠিকানা। এই ঠিকানাই তো সে গত আটনয় বছর ধরে সন্ধান করে ফিরছে। তাকে কেউই বলতে পারেনি। তার ছোট মামা এই ঠিকানা জানল কি করে? তবে কি গোপার কাকার সঙ্গে চিঠি পত্রে যোগাযোগ ছিল? অথচ সে কিছুই জানে না! গোকুল বারবার ঠিকানাটা পড়ল। মনে তার অনেক আশা জেগে উঠল। একটা স্যুটকেস ও সাইড ব্যাগে যা ধরে এমন কিছু দরকারী বই ও টুকিটাকি জিনিস ভরে নিয়ে সে বলল—খলিদ আমি ভাই ইণ্ডিয়ায় চললাম। যদি তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও, যেতে পার। আমি মনে করি, তুমি যখন মুক্তিফৌজে নাম লেখাও নি, তখন শুধু শুধু জানটা দেওয়ার জন্য এখানে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না!

খলিদ বলল—ছোটভাইকে বাড়ীর সংবাদ নিতে পাঠাইছি, দুদিনের মধ্যে ফেরার কথা, আজ তিনদিন হয়ে গেল কিন্তু ফিরে এল না। ও ফিরে না আসলে কোন "ডিসিশান" নিতে পারছি না।

—আমি তো ভাই আর দেরি করতে পারছি না, আমার আত্মীয় স্বজন চুয়োডাঙ্গা গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

—আচ্ছা তবে যাও ভাই, খোদা তোমার মঙ্গল করুন! তোমার আন্তরিকতা আমার মনে থাকবে।

গোকুল হোস্টেল থেকে বের হয়ে এ'ল। বাস রাস্তায় এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল কিন্তু কোন বাসের দেখা পেল না। একখানা বোমারু বিমান প্রচণ্ড আওয়াজ ছড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার বুকের মধ্যে ধরফর করতে শুরু করেছে। শহরের মধ্যে পাকিস্থানী খান সেনারা টহল দিচ্ছে। রাস্তায় লোক চলাচল বড়ই কম। এই সময় একখানা বাস এ'ল। ভিতরে গাদাগাদি লোকজন ও মালপত্তর। বাসের ছাদেও অনেক যাত্রী লট-বহর নিয়ে বসে আছে। বাসটা স্টপেজে দাঁড়ানোর সাথে সাথে দশ বারো জন মিলিটারী এসে ঘিরে দাঁড়াল। তারপর বাসের ভিতর, ছাদ সর্বত্র তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়ে কোন আপত্তিকর কিছু না পেয়ে তবেই যাত্রীদের ওঠা-নামা করতে দিল।

বিকালবেলা চুয়োডাঙায় পৌঁছে গোকুল অনুসন্ধান করে শান্তি হোটেলে গেল। শুনতে পেল সকলে তার জন্য দুদিন এখানে অপেক্ষা করে সেই দিনই সকালে মুক্তিবাহিনীর গাড়ীতে ইণ্ডিয়ায় রওনা হয়ে গেছে। গোকুল কয়েক ঘণ্টা হোটেলে বিশ্রাম করে রাত্রের দিকে মুক্তি বাহি'নীর গাড়ী পেয়ে তাতে করে ইণ্ডিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হল।

শুধু মুক্তিবাহিনীর জীপ কিংবা লরিতেই নয়, লাখো লাখো মানুষ পায়ে হেঁটে চলেছে। এর মধ্যে যত না হিন্দু তার অনেক বেশি মুসলমান। এতদিন যারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু বিতারণে মেতে ছিল তারাও এদের সঙ্গে মা-বোনের ইজ্জৎ বাঁচাতে, প্রাণে বাঁচ'তে ভারতের দ্বারস্থ হতে ছুটে চলেছে। রাস্তায় অসুস্থ হয়ে কতজন যাত্রায় ভঙ্গ দিয়েছে। কতজন পথের পাশেই ইহলোক যাত্রায় ছেদ টেনে দিচ্ছে। কতজন আহত হয়ে, পথ-কষ্টে আর্তনাদ করছে, কটুক্তি করছে। কেউ আবার রসিয়ে রসিয়ে গল্প করে সহযাত্রীর পথের ক্লান্তি ভুলিয়ে দিচ্ছে। তারা নব উদ্দমে পথ হাঁটছে। পথের যেন আর শেষ নেই। সময়ের কাঁটা যেন নিশ্চল হয়ে গেছে। মৃত্যু ভয়ে ভীত মানুষ জীবনের আশায় কি না করে! কোথায় না যায়! তবু নিয়তি পিছু ছাড়ে না। মৃত্যু এসে পথ আগলে দাঁড়ায়। পথের দুপাশে কত যে মৃতদেহ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে কে তার হিসাব রাখে! যারা যুদ্ধের গোলাগুলিতে প্রাণ হারাবার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল তাদের অনেকেই রাস্তায় অনাহারে, অসুস্থ হয়ে

বিনা চিকিৎসায় করুণ ভাবে প্রাণ দিচ্ছে। বাঙালী জাতির এই মৃত্যু মিছিলের শেষ যে কোথায় কে জানে!

প্রায় বেলা এগারোটার সময় মুক্তিবাহিনীর কয়েকখানা জীপ ও লরি এসে বনগাঁ শরণার্থী শিবিরের কেন্দ্রিয় অফিসের সামনে দাঁড়াল। সকলের সঙ্গে অভুক্ত গোকুলও জীপ থেকে নামল। এখানে নাম লিখিয়ে পরিচয় পত্র নিয়ে যার যার নির্দিষ্ট এলাকার আশ্রয় শিবিরে যেতে হবে। আর মুক্তিবাহিনীর গাড়ীগুলো খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ, যুদ্ধের প্রয়োজনীয় উপকরণ ইত্যাদি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাবে। পশ্চিমবঙ্গবাসীর উদ্যোগে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ-বাসীর কাছ থেকে যে সকল দ্রব্য-সামগ্রী এসে পৌছুচ্ছে সেই সকল মুক্তি বাহিনীর কর্ম কর্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

গোকুলকে যেতে হবে কল্যাণী আট নম্বর শিবিরে। এখান থেকে যে যার খরচে বা ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট স্থানে যাবে। পরিচয় পত্র দেখালে রেল কোম্পানী বিনা ভাড়ায় চলাচল করতে দেবে। গোকুল ঘন্টাখানেকের মধ্যে এখানকার কাজ মিটিয়ে রওনা হল। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় বঁনগা বাজারে এসে এক খাবারের দোকানে ঢুকল। গত কয়েকদিন সে প্রায় অভুক্ত ভাবে দিন কাটিয়েছে। এখন কিছু না খেলে তার চলবার শক্তি নেই। সে পেট পুরে কচুড়ি, আলুর তরকারি আর মিষ্ট খেল। তারপর রেলস্টেশনের দিকে হাঁটা দিল। এখান থেকে ট্রেনে করে প্রথমে রানাঘাট এবং তারপর সেখানে ট্রেন পাল্টে কল্যাণীতে যেতে হবে। সে স্টেশনে এসে অনুসন্ধান করে জানল ঘন্টা দুই পরে ট্রেন আছে। প্লাটফরমে শরণার্থীদের ভিড়। কোন বেঞ্চিতে বসার উপায় নেই। এই দু'ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকাও যায় না। গোকুল তার সাইডব্যাগ থেকে ছোট শতরঞ্চি বের করে একটা সুবিধামত জায়গা দেখে সেখানে পেতে বসে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে গিয়ে সে এক সময় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর সে একটানা সাত-আট ঘন্টা ঘুমিয়ে কাটাল। যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন বেশ রাত্রি হয়েছে। এর মধ্যে বার তিনেক রানাঘাট বঁনগাঁর মধ্যে ট্রেন যাতায়াত করেছে। আধঘন্টা বাদে আর একখানা ট্রেন আছে। এটাই শেষ ট্রেন। তার ঘুম ভাঙলেও ঘোর কাটতে কয়েক মিনিট সময় অতিবাহিত হ'ল। যখন খেয়াল হ'ল তখন সে দেখতে পেল স্যুটকেসটা পাশে নেই। সে অনেক খোঁজাখুজি করল কিন্তু কোন হদিস করতে পারল না। ওই স্যুটকেসের মধ্যে তার দামী দামী বই ও নিজের কিছু গল্প-কবিতা ছিল। আর ছিল অনেকগুলো

কানা লেখা একখানা নোটবুক, তাতেই কাঁচরাপাড়ার ঠিকানা লিখে াখেছিল। এত কিছুর মধ্যে এই নোটবুক খানার জন্য তার বড়ই আপশোষ ত লাগল। অতঃপর সে শেষ ট্রেনে চেপে রানাঘাট গেল। সেখানে স্টেশনে ত্রিযাপন করে পরদিন সকালে কল্যাণী যাত্রা করল।

১০

গোপার ট্রেনিং শেষ হয় হয় এমন সময় একদিন সে রেডিওর খবরে জানতে াবল পূর্বপাকিস্থানে গৃহযুদ্ধ বেঁধেছে। কাতারে কাতারে মানুষ প্রাণের ভয়ে াবত তথা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছে। আহত-পীড়াগ্রস্থ মানুষের ভিড়ে ালমাটাল। বহু জায়গায় শরনার্থী শিবির খোলা হয়েছে। এই সব দুর্গতদের নবা শুশ্রূষার জন্য চাই উদারপ্রাণা একনিষ্ঠ কর্মী। সরকারী নির্দ্দেশে াপাদের নির্দিষ্ট সময়েব আগেই ট্রেনিং সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়েছে। আহ্বান 'ল ইচ্ছুক নার্সদের শরনার্থীদের মধ্যে গিয়ে তাদের সেবা শুশ্রূষার কাজ করাব। ডাকে সাড়া দিয়ে গোপা কল্যাণীতে গিয়ে কার্য্যভাব গ্রহণ করল। যন্ত্রনা-াতর মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সে তৃপ্তি বোধ কবল।

দিন কুড়ি বাইশ পবে একদিন নাইট ডিউটি চলাকালীন একটি লোক এসে লল—দিদিমনি আপনে এট্, দয়া ক'রে আসেন, আমাগো ক্যাম্পে একজন াক মরতিছে।

গোপা তাড়াতাড়ি সহকারী ছেলেটার সঙ্গে ঔষধের বাক্স নিয়ে লোকটিকে ানুসরণ করল। গিয়ে দেখল প্রবল জ্বরের ঘোরে লোকটি বকে চলেছে—হায় াল্লা একি হল, আব কডা দিন বাঁচতি দিলে না? হরোদাদা, ব্রজদিদিরে াকপো বলে এ্যাদ্দুর আসলাম—কিন্তুক তা আর হ'লোনা য্যানে; ইবার মিঞ্জিরা বোঝ হেঁদু তাড়ানোর কি ফল? মান্ষির চোখির পানি ঝবালি জিগের (নিজেদের) চোখির পানি ঝরে ঝরে ঝরে। খান ফোজরা (ফৌজ) াগের মা বোনের ইজ্জুত মারলে এহোন (এ'খন) বুহি (বুকে) লাগতিছে া?

গোপার মনে পড়ল আট-নয় বছর আগে দেশ ছেড়ে আসার সময়ের থা। সে চিনতে পারল এই সেই আছিরদ্দি সেখ যার কোলে-পিঠে উঠে াপা ছোটবেলায় মানুষ হয়েছে। যে আছিরদ্দি শেষদিন একরাত্রে দশ-বারো াশ পথ নৌকা বেয়ে গোপনে গোপাদেরকে মাগুরা পৌছে দিয়ে গেছে। াপার দু'চোখ জলে ভরে উঠল। সে নিজেকে সামলে নিয়ে তার পাশে

হাঁটু মুড়ে বসে আছিরদ্দির মুখে-চোখে, কাপালে ঠাণ্ডা জলের ছোপ বুলিয়ে দিতে দিতে আস্তে আস্তে ডাকল—আছিরদ্দি চাচা আমি গোপা, হরনাথ মিত্রে মেয়ে, তুমি যাকে ছোট বেলায় কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছ ; এই নাও ওষুধ খাও। গোপা তার মুখে দুটো ট্যাবলেট দিয়ে একটু জল ঢেলে দিল।

আছিরদ্দি অনেক কষ্টে একবার চোখ খুলে গোপাকে দেখল। তার দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তারপর চোখ বন্ধ করে একবার নড়ে উঠে তার শরীর শান্ত হয়ে গেল। গোপা তাড়াতাড়ি তার হাত টেনে পরীক্ষা করে নিয়ে দেখল কোন "পালস্" পাওয়া যাচ্ছেনা। গোপা সঙ্গের ছেলেটিকে বলল—রমেশদা শীগগির ডাক্তার বাবুকে ডেকে আনুন। আর আমার বাবাকে আসার জন্য একটা টেলিগ্রাম করে দিন, যেমন করে পারেন!

কিছুক্ষণের মধ্যে জীপে করে ডাক্তার বাবু এসে পড়লেন। তিনি ভাল করে পরীক্ষা করে মুখে উচ্চারন করলেন-"ডেড্।"

—কি বললেন ডাক্তারবাবু, ডেড ? চাচাজান তাহলে নেই ?

ডাক্তার ধমকে উঠলেন—কি করছেন মিস মিত্র ? নার্সদের মৃত্যু দেখে কাঁদলে চলে ? ওকে ছেড়ে চলুন ডিস্‌পেন্সারীতে যাই, আবার দেখি কোন "কল" এ'ল!

—না ডাক্তার বাবু, আমি এখন ওকে ছেড়ে যেতে পারছি না। লোকটি আমাদের বড়ই আপনজন ছিল। আমাদের দেখার জন্যই বেচারী কত ক স্বীকার করে এতদূরে এসেছিল, নাহলে অন্য সবার মতো নিজের জীবন বাঁচাতে ও এতদূরে ছুটে আসত না।

ডাক্তারবাবু বললেন—বুঝলাম আপনার কথা; যে চলে গেছে তাকে তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না ? এখন মিছে কান্নাকাটি করে কোনই লাভ হবে না। আচ্ছা আমি এগোচ্ছি, আপনি একটু শান্ত হয়ে আসুন। রমেশ ফিরে এলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব "ফিউনারেলের" ব্যাবস্থা করতে বলবেন। ডাক্তার বাবু জীপে গিয়ে বসলেন। জীপ এগিয়ে চলল।

গোপা শবদেহের পাশে চুপ করে বসে রইল।

সকাল বেলা হরনাথ যখন এলেন তখন শবদেহ নির্দিষ্ট স্থানে কবর দেওয়া হয়ে গেছে। হরনাথের ইচ্ছা অনুসারে রমেশ ক্যাম্পের একটি ছেলেকে কাঁচরাপাড়া পাঠাল ফুল আর ধূপকাঠি আনতে। এগুলো এলে হরনাথ গোপাকে সঙ্গে নিয়ে মাইল খানেক পথ পায়ে হেঁটে মাঠের মধ্যে যেখানে মাটির তলা

াছিরদ্দিকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল সেই মাটির ঢিপির উপর ফুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে সবগুলো ধূপকাঠি একসঙ্গে জ্বালিয়ে মাটিতে গেঁথে দিতে এক স্বর্গীয় সুবাসে স্থানটা ভরে উঠল।

হরনাথ এক খণ্ড কাগজে লিখলেনঃ—

"আর আসিও না বন্ধু এপারে,
এই হিংসা দ্বেষ ভেদাভেদ মাঝারে
মানুষ চায় যেথা মানুষের সর্বনাশ
উগরিয়া বিষ নিমেষে ভাঙে বিশ্বাস
ভালোবাসা যেথা শিশিরের কণা নিমেষে শুকায়—
আর সেথায় আসিওনা ফিরে, বিদায় বন্ধু বিদায়।

হরনাথ ছলছল চোখে সেখান থেকে ফিরে চললেন। চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের চেনা আর কারো সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

গোপা বলল—না বাবা।

বাকীপথ সকলে নীরবে হেঁটে ক্যাম্প অফিসে এলেন। হরনাথ এখানেই স্নান আহার করলেন।

বিকালে গোপা বাবার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত গেল। এখন তার বাড়িতে যাবার অনুমতি নেই।

গাড়ীতে ওঠার আগে হরনাথ বললেন—ছুটি পেলেই বাড়ী যেও, তোমার মা তোমার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

—যাবো বাবা, কিন্তু কবে যে ছুটি পাব তার ঠিক নেই। এখানে আমাদের ভীষণ কাজের চাপ। শিফটিং ডিউটি হলেও আমরা চব্বিশ ঘণ্টার জন্য "স্ট্যাণ্ড বাই" আছি। যতদিন শরণার্থীরা থাকবে ততদিন আমাদের কোন ছুটি নেই। মুক্তিফৌজের আহত ভলান্টিয়ারদের সেবা করার জন্য যে কোন মুহূর্তে আমাদেরকে পূর্ববঙ্গে যেতে হতে পারে।

এই কথায় হরনাথ বেশ চিন্তান্বিত হলেন; কারণ পূর্ববঙ্গে এখন ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। কাতারে কাতারে লোক মরছে। সেখান গিয়ে কাজ করা জীবনের বড়ই ঝুঁকি। তিনি মেয়েকে বললেন না মা, সেখানে তোমার যাওয়া হবেনা, তোমার এমন চাকরি করতে হবেনা। তুমি এখনই এ চাকরিতে 'রিজাইন' দাও।

গোপা বলল—তা কি হয় বাবা? সাধারন সময়ে ছাড়ি সে কথা আলাদা,

কিন্তু যেখানে আমাদের সত্যিকারের দরকার সেখানে বিপদের ভয়ে না যাওয়া বা পিছিয়ে আসা মানেই কর্তব্যে অবহেলা করা সবাই যদি মরণের ভয়ে পিছিয়ে আসে তাহলে আমাদের দেশে পুলিশ, মিলিটারী, দমকল ; মিলিটারী ডাক্তার, নার্স, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি কেউই থাকবে না। তাহলে কাজ চলবে কি করে। আর দেশবাসীর প্রতি আমাদের কী মমত্ববোধ রইল ? মৃত্যু সবখানেই আছে বাবা, যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যায়নি, জীবনে গোলাগুলি দেখা তো দূরের কথা—নাম পর্যন্ত শোনেনি, তাকেও অসময়ে প্রাণ দিতে হচ্ছে। আবার কত সৈনিক জীবনে বহু যুদ্ধে দেহে একাধিক বুলেটের আঘাত নিয়েও বেঁচে আছে। তা আমি কথা দিচ্ছি, ইচ্ছা করে যাবনা। কিন্তু যদি ডাক আসে আমাকে যেতে হবে বাবা, তখন আমার জন্য যেন কোন দুঃখ করবেন না।

গোপার কথায় হরনাথের সন্তানগর্বে বুক ভরে উঠল। তিনি মনে মনে বললেন—সে দেশ আমাদের ত্যাগ করতে পারে কিন্তু আমরা তাকে ভুলি কি করে ? সেই দেশের মাটিতেই তো তিনি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রকৃতি মায়ের আলো-হাওয়ায় আদর-চুম্বন সোহাগে, জীবনের আটত্রিশটি বসন্ত কাটিয়ে এসেছিলেন। কত বর্ষার রুদ্ররূপ, কত অনাবৃষ্টির নির্মম নিদাঘ প্রদাহ ; মাইলের পর মাইল অতল জলের উপর আমন ধানের শীষ ; শাপলা ফুলের শোভার রাজ্য আম, কাঁঠাল, কলা, লিচু ফলের বাগান, শীতের দিনে খেঁজুর গাছে বাঁধা মাটির ঠিলে, আখবোঝাই গরু-মোষের গাড়ী সবই একে একে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সেই দেশের বিয়োগব্যথায় তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল তিনি মেয়েকে আর নিষেধ করতে পারলেন না ; নিঃশব্দে গাড়ীর কামরায় গিয়ে উঠলেন।

গোপা বাবাকে বিদায় দিয়ে ক্যাম্প অফিসে ফিরে এ'ল। ঘরে ঢুকে খাটিয়ার চাদরটা একটু টেনেটুনে ঠিক করে লম্বালম্বি হয়ে শুয়ে পড়ল। আবার আজও রাত্রে ডিউটি করতে হবে। ডিউটিতে দিনে কিংবা রাত্রে একদণ্ড বিশ্রাম নেওয়া যায় না। এখানে শিবিরগুলিতে অসংখ্য অসুস্থ রুগী রয়েছে প্রতিদিনই কোন না কোন শিবিরে মৃত্যু লেগেই আছে। আছে নবজাতকের আবির্ভাব। অনেক অবিবাহিত, বিধবা নারীকেও নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে খান সেনাদের ঔরসে অবৈধ সন্তানকে ভূমিষ্ঠ করতে হচ্ছে। তাদের নিজেদের ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয় জেনে সরকারী বেসরকারী জনদরদী ব্যক্তি ও সংস্থা থেকে বারবার প্রচার করা হচ্ছে 'কেউ যেন অবৈধ সন্তানের নিষ্পাপ জননীদের

ছোট নজরে না দেখে। তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে যেন তারা আন্তরীক প্রীতি ও সহানুভূতি পূর্ণ ব্যবহার থেকে বঞ্চিত না হয়। দুর্ভাগ্য প্রপীড়িত লাঞ্ছিত নারীদের কথা বঙ্গবন্ধু সেখ মুজিবর রহমান ও তার অনুগামীরা গভীর ভাবে চিন্তা করছেন।

এত ঘোষণা সত্ত্বেও কোন কোন শুচিশুদ্ধ নারী নিজেকে অশুচি ও দোষী সাব্যস্ত করে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে। এত দুঃখের মধ্যেও কোন কোন দরদী আত্মা কেঁদে উঠে অপরের দুঃখের অংশ নিতে এগিয়ে আসছে। হচ্ছে শিবিরে শিবিরে ভিন্ন জাতি, ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোনীত পাত্র-পাত্রীর বিয়ে-সাদী। কোন কোন নির্ভীক যুবক ঘোষণার বাস্তব রূপায়ণে অবৈধ সন্তানসহ তার জননীর দায়িত্ব স্বইচ্ছায় বহন করতে এগিয়ে আসছে। মুক্তি-বাহিনীর অর্থভাণ্ডার থেকে তাদেরকে আর্থিক অনুদান ও অন্যান্য সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। এ বড় বিচিত্র জীবন। স্বজন হারানো ব্যথা আছে, পথে নানা বঞ্চনার ইতিহাস আছে। মনের রুদ্ধ কক্ষে আছে অনাহার-অত্যাচারের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আছে অচেনার সঙ্গে নব পরিচয়ের আনন্দ। আছে বিচিত্র পরিবেশে সম-অসম প্রেমে ও প্রয়োজনে নারী পুরুষের মিলন অনুষ্ঠান।

শিবিরবাসী সকলের মাথাপিছু চাল, গম/আটা এবং তরি-তরকারী, নুন-তেল বাবদ কিছু নগদ পয়সা বরাদ্দ আছে। আছে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে কেরোসিন তেল, সাবান, চিনি ইত্যাদির সরবরাহ। জামা কাপড়, কম্বল, গুড়ো দুধ, সবই কিছু কিছু দেওয়া হচ্ছে। ভারত সরকারের উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়ে দেশ বিদেশের বহু জনদরদী সংস্থা শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী পাঠাচ্ছে। সবারই ইচ্ছা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান জয়ী হউন।

নাইট ডিউটি চলাকালীন গোপা শুনেছে কে যেন মাঝে মাঝে বাঁশি বাজায়। আছিরদ্দির দেখা পেয়ে তার মন আশায় ভরে ওঠে এইভেবে যে, গোকুল হয় তো বা এসেছে। সে ভাবতে থাকে কত আদরের ছেলে গোকুল এই শিবিরে জীবন যাপন করছে। রাত্রে গোপা কান পেতে রইল বাঁশি শুনবে বলে। কিন্তু সে রাত্রে বাঁশির সুর শোনা গেলনা। গোপা অনেক অস্বস্তিতে কাটিয়ে পরের দিন সকালে অনুসন্ধান করতে বেরুল রাত্রে আট নম্বর শিবিরের আশে পাশে কে বাঁশি বাজায়। অনেক অনুসন্ধান করে একজন বাঁশি বাজানো লোকের খোঁজ পাওয়া গেলেও তার নাম জানা গেল না, লোকটার

সঙ্গে গোপার দেখা হ'ল না। মাত্র সে কয়েকদিন আগে এই ক্যাম্পে এসেছিল, আবার গতকালই কাউকে কিছু না বলে চলে গেছে। লোকটার সম্বন্ধে যা জানা গেল—তা হল খুব ছিপছিপে লম্বা, রোগা চেহারা। মুখে একরাশ দাড়ি-গোফ। সব সময় নিজের মনে কি সব হিজিবিজি লেখে আর সন্ধ্যা বেলায় বাঁশি বাজায়। একমাত্র বাঁশি বাজানো ছাড়া আর কোন বর্ণনাই গোপার মনঃপূত হ'লনা। কারণ সে গোকুলকে রোগা চেহারায় দেখেনি। অত লম্বাও দেখেনি। হিজিবিজি লেখার বাতিক আছে কিনা তাও তার জানা নেই। যাই-হোক লোকটার দেখা পেলে খোঁজ খবর নিয়ে জানা যেত সে কে? কিন্তু তাকে তো এখানে পাওয়া যাচ্ছেনা! সে গেলই বা কোথায়? গোপা রেশন অফিসে এসে খোঁজ কবল গোকুল নামে কারো নাম নাথিভূক্ত হয়েছে কিনা। সেখানে দেখা গেল গোকুল দত্ত নামে একজনের নাম তালিকাভূক্ত হয়েছে কিন্তু সে এখনো কোন দ্রব্য নেয়নি। লোকটা তাহলে তার প্রিয়জন গোকুলই? আশ্চর্য্য! সে এ ক'দিন এখানে কি খেয়ে আছে? আর এখনগেলেই বাকোথায়? গোপা ডিউটির অবসরে প্রত্যেকদিন আট নম্বর শিবির ছাড়াও অন্যান্য শিবিরে অনুসন্ধান করে ফিরছে গোকুলের দেখা পায় কিনা! এখানে তিরিশ-বত্রিশটা শিবির, প্রত্যেক শিবিরে দেড়শো দু'শো করে লোক; তার উপর আছে আপনজন খুঁজে বার করার তাগিদে অন্যান্য অঞ্চলের শিবিরবাসী কিংবা পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী আত্মীয়-স্বজনদের গমনাগমন। এত লোকের ভিড়ে কাউকে খুঁজে বের করা বড়ই দুরুহ কাজ। দুরুহ বা দুঃসাধ্য যাইই হোকনা কেন এ কাজ তো তাকে করতেই হবে; গোপা মনে মনে শপথ নেয়।

১১

সেদিন গোকুল ত্রান শিবিরের অফিসে এসে তার পরিচয়পত্র দেখালে কর্মরত লোকটি একটা খাতায় লিখে নিয়ে বলল—কাল কিংবা পরশু এসে আপনার কার্ড নিয়ে যাবেন। কার্ডে আপনি সাপ্তাহিক বরাদ্দে চাল গম/আটা ইত্যাদি পাবেন এবং রান্না করে খেতে পারবেন। যে ক'দিন রেশন না পাচ্ছেন আপনি এই "স্লিপটা" দেখালে ওই বড় তাঁবুতে দুপুরে ও রাত্রে খেতে পাবেন।

স্লিপটা পাঞ্জাবীর পকেটে রেখে সে অনুসন্ধান করে করে আট নম্বর ক্যাম্পে এল। শিবিরে অসংখ্য ছোট তাঁবু খাটানো। এক একটি তাঁবুর মধ্যে আবার একাধিক পরিবার। গোকুল যে পরিবারটার সঙ্গে আশ্রয় পেল তারা বজবজুর

সেখ মুজিবরের বাড়ীর পাশের লোক। মুসলমান। এই অঞ্চলে অত্যাচার হয়েছে নাকি সবচেয়ে বেশি। এই পরিবারের বৌ দুই সন্তানের জননী রোকেয়া নদীতে স্নান করে আসার সময় টহলদারী খান সেনাদের নজরে পড়ে যায়। ফলে যা হবার তাই হ'ল। তারা তাদের তাঁবুতে ধরে নিয়ে গেল। যখন গ্রামের লোকেরা খবর পেয়ে সেখানে চড়াও হ'ল তখন ক্ষুদ্রদেহী রোকেয়া পাঁচ পাঁচটি পাঠান মুসলমানের পাশবিক কাম তাড়নার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে জীবনের উনিশটি বসন্ত পার হবার আগেই ইহলোক ত্যাগ করে গেছে। এর ক'দিন পরেই ঘোরতর লড়াই বাধল। বাধ্য হয়ে রহিম মণ্ডলকে বিধবা মা, আট বছরের বোন আমিনা ও ছোট ছোট দুটো শিশু সন্তানকে নিয়ে ভারতে পলায়ন করতে হ'ল। গোকুল এদের দুঃখের ইতিহাস শুনতে শুনতে নিজের পথশ্রমের সকল ক্লান্তি ভুলে গেল। গত কয়েকদিন গোকুলের স্নান হয়নি। এখানে কয়েকটা শিবির পিছু মাত্র একটা করে টিউব ওয়েল। কলের মুখে সব সময়ই দারুন ভিড়। তাছাড়া তার কোন পাত্রও নেই যাতে করে জল ধরে স্নান করবে। অবস্থা বুঝে রহিম মণ্ডল বলল—চলেন বাবু, দশ মিনিট হাঁটবার পারলি আরাম কইরা চান করবেন! এখানে মস্ত এক দীঘি রইছে!

গোকুল রহিমের সঙ্গে দীঘির পাড়ে এল। সত্যিই প্রকাণ্ড এক দীঘি, গভীর কালোজলে ভর্তি। শিবিরবাসী অনেকেই এখানে এসে স্নান করছে। কয়েকদিন পরে এমন অবগাহন স্নান করে গোকুল বড়ই তৃপ্তি পেল। পথ-শ্রমের ক্লান্তি অনেক কমে গেল। শিবিরে ফিরে এসে শুনতে পেল কোথায় যেন ঢং ঢং করে আওয়াজ হচ্ছে। রহিমের মা বুঝিয়ে দিলেন রসুই শিবিরে খাওয়ার ঘণ্টা পড়েছে। রহিম মণ্ডলরা রেশন কার্ডধারী; অতএব গোকুলকে একাই পাকশালায় যেতে হল। মস্ত বড় তাঁবুর মধ্যে কাঠের তক্তায় এক সঙ্গে বহু মানুষ খেতে বসেছে। শালপাতার উপর প্রমান সাইজের একহাতা করে খিঁচুড়ি। তার মধ্যে বেগুন, পটল, আলু, মিষ্টিআলু, কুমড়ো ইত্যাদি আনাজ। এ যেন কোন মহোৎসবের প্রসাদ, খিদের মুখে সব অমৃত মনে হচ্ছে। গোকুল আহার সমাধা করে নিজের তাঁবুতে ফিরে এল।

প্রতিদিন গোকুল অধিকাংশ সময় ঘুরে বেড়ায়। শিবিরে শিবিরে গিয়ে বাবা মা, অন্যান্য আত্মীয়দের খোঁজ করে। কিন্তু কারোর সঙ্গে দেখা হয়না। অবশেষে অনুসন্ধান অফিসে গিয়ে সে জানতে পারল তাঁদের নাম এখানকার রেজিষ্টারে নেই। একদিন সে বনগাঁ গিয়ে ঘুরে এল। না, সেখানেও তাঁদের

কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। তবে কি তাঁরা হাটা পথে আসছেন? গোকুল চিন্তিত হয়ে পড়ল। হাঁটা পথে আসার কষ্ট সে দৃষ্টি গোচর করে এসেছে। কিন্তু এ চিন্তা' কোন যুক্তি নেই, সে চিন্তা করে কোনই সমাধান করতে পারবেনা।

রহিম মণ্ডলের সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়েছে। একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করে। রহিমের ছোট ছুটো ছেলেমেয়ে ও বোন আমিনা সকলেই গোকুলের ভক্ত হয়ে উঠেছে। সে হাসিঠাট্টায়, গল্প করে তাদের বিষাদ মনে হাসি ফুটিয়ে তোলে। গোকুল অনেক জিনিস হারালেও বাঁশিটা চুরি যায়নি। সেটা সাইডব্যাগের মধ্যে ছিল। এই তিনটি শৈশব ও বাল্যের ছেলেমেয়েকে শান্ত করতে বাধ্য হয়ে গোকুলকে পরিবেশের কথা ভুলে গিয়ে মাঝে মাঝে বাঁশিতে ফুঁ দিতে হয়। আর এতে সে নিজের মনেও মুক্তির স্বাদ পায়।

গোকুল একদিন কথায় কথায় জানতে পারল কাঁচরাপাড়া অতি নিকটে, মাত্র একটা স্টেশন পরে। তার মন পুলকে নেচে উঠল। এটাই তার একমাত্র ভরসা। মা বাবার সন্ধান তো পাওয়া যাবেই, পাওয়াযেতে পারে মানসী প্রেমিকার সন্ধানও। কিন্তু আজ নয় বছর পরে তাকে কি ভাবে, কোন পরিবেশে সে দেখবে? এতদিনে গোপার বয়স বাইশ/তেইশ হয়েছে। এ বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে একাধিক সন্তানের জননী হবার কথা। মনটা একটু দমে গেলেও গোকুলের মনে হ'ল গোপার সঙ্গে একবার দেখা না হলে তার অস্বস্থি দূর হচ্ছে না। ঠিকানা লেখা নোটবুকখানা হারিয়ে গেলেও গোপার কাকার ঠিকানা গোকুলের মনে গাঁথা হয়ে আছে।

পরের দিন সকালে কাঁচড়াপাড়া গিয়ে অনেক খোঁজাখুজির পর ২০৪। সি টাইপ-টু কোয়ার্টার বের করতে সক্ষম হলেও তার মনের আশা পূর্ণ হ'লনা। বর্তমানে যিনি এই কোয়ার্টারের বাসিন্দা তিনি গত আট বছর ধরে বাস করছেন। এর আগে কে ছিলেন তিনি বলতে পারেন না। বোঝা গেল গোপার কাকা অন্য কোথাও বদলি হয়ে গেছেন এবং তা অনেক দিন আগেই। তিনি কোথায় বদলি হয়েছেন এ খবর কেউ বলতে পারল না। আর এতদিন পরে কারো পক্ষে বলাও সম্ভব নয়।

গোকুল নিরাশ হয়ে ক্যাম্পে ফিরে চলেছে। স্টেশনে এসে প্লাটফরমের বেঞ্চিতে বসে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছে, এমন সময় বাংলা খবরের কাগজ দেখে পূর্ববঙ্গে যুদ্ধের খবর জানার জন্য সে একখানা কাগজ কিনে পড়তে লাগল।

কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় রয়েছে যশোহর ক্যান্টনমেণ্ট মুক্তিফৌজের করায়ত্বে। সেখ মুজিবর রহমান পূর্ববঙ্গকে স্বাধীন বাংলাদেশ বলে ঘোষণা করেছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি বহু জায়গায়ই মুক্তিফৌজের জয়যাত্রার কথা। গোকুল মনে মনে বেশ খুশিই হ'ল।

এই সকল পড়তে পড়তে বিজ্ঞাপনের পৃষ্টায় ছোট্ট একটা খবর তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এটি একটি কর্মখালির বিজ্ঞাপণ।

"বয়োঃজেষ্ঠা বৃদ্ধাকে সকাল সন্ধ্যা ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করিয়া শোনানোর জন্য ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন উদারচেতা ব্যক্তি অবশ্যক। অল্প শিক্ষিত/শিক্ষিতা চলিতে পারে। থাকা-খাওয়াও নাম মাত্র পারিশ্রমিক। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ বাঞ্ছনীয়।"

বিজ্ঞাপণটি যখন আজই বেরিয়েছে তখন তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করা দরকার, দেরি হলে সুযোগটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গোকুল একটু ভেবে নিয়ে কোলকাতার টেনে চেপে বসল। তার অভিপ্রায় কোথাও একটা আশ্রয় জুটে গেলে সে ক্যাম্প থেকে চলে আসবে। সেখানে আহারের ব্যবস্থা থাকলেও দুরাবস্থার অন্ত নেই। রেশনের জিনিস আনতে গেলে প্রায় সারাদিন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে কাটাতে হয়। মানুষের ভিড়ে একটুও স্বস্তি নেই। যেখানে-সেখানে মলমূত্র; কফ থু-থুর ছড়াছড়ি। শিবির কর্মীরা পরিষ্কার করা মাত্রই তা নোংরা হয়ে যায়। অগনিত অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত অবুঝ নরনারী শিশুর দল—সবাই নিজ নিজ বোধ শক্তিতে অবুঝের কাজ করে। ক'জনকে আর সামলে রাখা যায়! গোকুলের পক্ষে বড় সমস্যা হল প্রস্রাব পায়খানার সমস্যা। শিবির বাসীদেব জন্য যে পায়খানা করে দেওয়া হয়েছে গোকুল তার ধারে-কাছে যেতে পারে না।

শিয়ালদা নেমে গোকুল জিজ্ঞাসা করে করে কৈলাস বোস স্ট্রীটে এল। খোঁজ করে নির্দিষ্ট নম্বরের বাড়ীর সামনে এসে সে দাঁড়াল। মস্ত বড় বাড়ী কিন্তু ভিতরে যাবার কোন উপায় সে খুঁজে পাচ্ছে না। দরজা বন্ধ রয়েছে। সে বার কয়েক বন্ধ দরজায় টোকা দিয়ে দেখল কিন্তু কেউ দরজা খুলে দিল না। এবার সে মৃদু মৃদু কড়া নাড়তে লাগল। না, তবুও কেউ দরজা খুলছে না। সে হতাশ হয়ে পড়ল। জনা দুই তরুণ কাছেই একটা বাড়ীর রোয়াকে বসে গল্প করছিল। একজন এগিয়ে এসে তাকে বলল—এই "কলিং বেলটা" টিপুন।

ছেলেটির কথা মত গোকুল ডানদিকের সাদা রঙের সুইচটা টিপতেই দরজা

ভিতর থেকে খুলে গেল। একটি বাইশ তেইশ বছরের সুশ্রী সুন্দরী মেয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল। মেয়েটির চোখে পুরু লেন্সের চশমা। সে জিজ্ঞাসা করল—কাকে খুঁজছেন ?

হঠাৎ কি বলবে গোকুল ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। সে হাতে ধরা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপণের জায়গা টা মেয়েটির সামনে মেলে ধরল।

মেয়েটি একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল—আপনিই কি ক্যাণ্ডিডেড ?

—হঁ্যা। গোকুল মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

—আচ্ছা ভেতরে আসুন। মেয়েটি ভিতর বাড়ীতে এসে ডেকে বলল—বৌদি, এই ভদ্রলোক বিজ্ঞাপণ দেখে এসেছেন।

গোকুল দেখতে পেল দোতলার সিঁড়ির মুখে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে একটি সুন্দরী বৌ। সে বলল—তোমার দাদা তো আসবেন সেই দেড়টার সময়! তারপর সে নিচেই এসে বলল—এই চেয়ারটায় বসুন। আপনি কোথা থেকে আসছেন ?

চেয়ারে না বসে গোকুল বলল—পূর্ববঙ্গ থেকে। আমরা যুদ্ধের জন্য এদেশে চলে এসেছি, এখন কল্যাণী শরনার্থী শিবিরে আছি।

—আপনার আর কে কে আছেন ?

—মা আর বাবা ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁরা কে কোথায় আছেন জানি না। তাঁদেরকে খুঁজে পাচ্ছি না। তাঁরা বেঁচে আছেন কিনা তাও বলতে পারি না।

—কতদূর লেখাপড়া করেছেন ?

—এম এ পড়ছিলাম কিন্তু আর পরীক্ষা দেওয়া হ'ল না।

—এম এ ? না না আমাদের এত লেখাপড়া জানা লোকের প্রয়োজন নেই। আর তাছাড়া আমরা আপনার উপযুক্ত পারিশ্রমিকও দিতে পারব না।

কথা শুনে গোকুল হতাশ হয়ে চেয়ারে বসে পডল। দুর্ভাবনায় সে মাথা তুলতে পারল না।

তার অবস্থা দেখে বৌটির মন দরদে ভরে ওঠে। সে জিজ্ঞাসা করল—আপনার কি এ কাজটা খুবই প্রয়োজন ? মানে বলছিলুম কি টাকা-কড়ি তো হাতে তেমন কিছু পাবেন না; অথচ দিন রাত্রি এখানে আটকে থাকতে হবে। আপনার কম বয়স লেখা পড়াও ভালো জানেন, চেষ্টা করলে ভালো চাকরি পেয়ে যেতে পারেন; শুধু শুধু আমরা আটকে রেখে আপনার ভবিষ্যৎ নষ্ট করব কেন এই ভেবেই কথাটা বলছি ··

গোকুল মুখ তুলে বলল—সত্যি কথা বলতে কি আমার ক্যাম্পে খাওয়া জুটলেও থাকতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। একটা যে কোন আশ্রয় পেলে আমি আর পূর্ববঙ্গে ফিরে যাব না ভাবছি। আর ভালো চাকরি আমার হবে না, হওয়ার আশাও নেই। যেটা সাধারণ এবং পাওয়া সম্ভব মনে করে আশা নিয়ে ছুটে এসেছিলাম সেটাই যখন অসম্ভব হয়ে পড়ছে…

বউটি গোকুলের মনের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করল। সে বলল—আপনার কথা বুঝতে পেরেছি। আমার বাবাও একদিন সহায় সম্বলহীন হয়ে পূর্বপাকিস্থান থেকে কোলকাতায় এসেছিলেন; সে সব গল্প শুনলে আমরা এখনও ভয়ে শিউরে উঠি। "উনি" তো দেড়টার সময় খেতে আসবেন, এই আড়াই ঘণ্টা কি আপনি অপেক্ষা করতে পারবেন!

গোকুল আশায় উদ্দীপিত হয়ে উঠল। বলল—আপনি যদি বলেন তাহলে আমি অপেক্ষা করি।

—আমি যদি বলি তাহলে কোথায় অপেক্ষা করবেন? কাছে পিঠে কি কোথাও জানাশোনা আছে?

—না বৌদি আমার কেউ জানাশোনা নেই, জীবনে এই প্রথম কোলকাতায় এসেছি। আমি এমনিই কাছাকাছি রাস্তায় ঘুরে এটুকু সময় কাটিয়ে দেব। আমি তাহলে ঘুরে আসি? গোকুল ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইরে যাওয়ার উপক্রম করল।

বৌটি এই সময় বলে উঠল—দাঁড়ান যাচ্ছেন কোথায়? এই রোদ্দুরের মধ্যে আপনাকে কোথাও ঘুরতে হবে না। আপনি আমাদের বাইরের ঘরে গিয়ে বসুন; যাও তো ঠাকুর ঝি উনাকে ঘরটা দেখিয়ে দাও।

মেয়েটি গোকুলকে নিয়ে সদর দরজার পাশে একটি ঘরে এসে বসিয়ে রেখে চলে গেল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে একজন বৃদ্ধা এসে ঘরে ঢুকলেন। তিনি আরাম কেদারায় বসে কাঁপা গলায় বললেন—তোমার নাম কি বাবা?

—আমার নাম গোকুলেশ্বর দত্ত। আপনার শরীর কি অসুস্থ?

—হ্যাঁ বাবা আমার শরীরটা বিশেষ ভালো না। গতবছর আমার স্ট্রোক হয়েছিল। তারপর থেকে নানা ব্যাধি আক্রমণ করছে। ডান চোখে দেখতে পাই না, কথা বলতে গেলে স্বর বেরুতে চায় না, মাথা নিচু করে বই পড়তে পারিনা, নানারকম অসুবিধা বাবা! আমার বাবা ছিলেন ভট্টাচার্য্যি বামুন,

সব-সময় জপ-তপ পূজা পার্বণে শাস্ত্র পাঠে জীবন কাটিয়েছেন। তার মেয়ে হয়ে শেষ জীবনে এ কী শাস্তি বলতো? ছেলেকে বললুম—বাবা ভবতোষ, তুই একটু গীতা রামায়ণ পড়ে পড়ে আমাকে শোনা! কিন্তু ছেলের একেবারে সময় নেই। বৌমাও নিজে পুজো-আচ্চা নিয়ে দিন কাটায়। মেয়েটা ইউনিভারসিটির মোটা মোটা বই পড়ে এমদম সময় পায় না। তাই বাবা বৌমা বিজ্ঞাপণ দিয়ে তোমাকে ডেকে এনেছে। তুমি বাবা এই বুড়ি মানুষের আব্দার সয়ে এ বাড়ীতে থাকবে তো? তুমি চলে গেলে আমি খুব দুঃখ পাব বাবা!

—আমি তো মা এখানে থাকার জন্যই এসেছি, আমাকে আপনারা রাখলে আর তাড়িয়ে না দিলে আমি কোথাও যাব না।

—সত্যি? হ্যাঁ আর কি যেন বললে, মা? এ যে আমার পরিতোষের গলা! হায় হায়! সে যদি আজ বেঁচে থাকত তাহলে কি আমার এই দশা হয়?

—আবার মা আপনি এখানে এসে পাগলামি শুরু করেছেন? আপনি যে বললেন জপে বসবেন? আপনি যান, জপে গিয়ে বসুন। গোকুল দেখল কথা-গুলো বলতে বলতে বৌটি একখানা থালা আর জলের গেলাস নিয়ে ভেতরে ঢুকছে। থালায় খানকতক লুচি, বেগুন ভাজা, সুজি ও একটা সন্দেশ সাজানো রয়েছে।

—এই যাই বৌমা, এই ছেলেটি বেশ ভালো, দ্যাখো একে রাখতে পারো কিনা। বৃদ্ধা পা টেনে টেনে হেঁটে ভিতরের বাড়ীতে চলে গেলেন।

বউটি থালাখানা সুমুখে টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বলল—আপনি ওই কলতলা থেকে হাতমুখ ধুয়ে এসে এগুলো খেতে শুরু করুন, আমি ততক্ষণে আপনার চা নিয়ে আসি। ঠাকুরঝি তুমি একটু দাঁড়িয়ে দ্যাখো বিড়াল এসে না মুখ দেয়।

গোকুল সকাল থেকে কিছুই খায়নি। তার খিদেও পেয়েছে বেশ। এই বৌটিকে তার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা বলে মনে হ'ল। একটু ইতস্ততঃ করে সে চেয়ার থেকে উঠে হাত মুখ ধুতে যাবার সময় বলল—আমি চা খাই না। ফিরে এসে সে পরিতৃপ্তি সহকারে জলখাবার গুলো খেয়ে নিয়ে পাশে রাখা পত্রিকাখানা পড়তে লাগল।

বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ সেই মেয়েটি এসে টেবিলের উপর তেল সাবান আর তোয়ালে রেখে বলল—ওই বাথরুম থেকে আপনি স্নান করে আসুন।

গোকুল বলল—না আর স্নান ক'রব না, একটু পরে আপনার দাদার সঙ্গে দেখা করেই চলে যাব

সে কি ? এ ভাবে চলে যাবেন কেন ? বৌদি যে আপনাকে স্নান করতে বলল—আপনার জন্য রান্না হয়েছে, আর তাছাড়া আপনি তো থাকবেন বলেই এসেছেন ···

গোকুল বলল—আমাকে রাখা হবে কিনা তাতো এখনও ঠিক হয়নি, শুধু শুধু আপনাদেরকে এত কষ্ট দেব কেন ? তাছাড়া একটু আগে তো জলখাবার খেয়েছি !

মেয়েটি হেসে বলল—ওঃ এই কথা ? আচ্ছা তাহলে শুধু স্নানটাই সারুন, না হয় না খেয়েই যাবেন। গোকুল তখনও ওঠার কোন লক্ষণ দেখাল না দেখে মেয়েটি আবার বলল—দেখুন এই অপরাধেই আপানার হওয়া চাকরি টি কিন্তু হারাতে পারেন !

মেয়েটি রহস্য করছে কিনা গোকুল তখনও বুঝে উঠতে পারছে না এমন সময় বৌটি এসে তাকে বলল—আপনি তাড়াতাড়ি স্নান সেরে আসুন, আমার রান্না হয়ে গেছে, উনি এক্ষুনি খেতে আসবেন।

গোকুল বুঝতে পারল এ নির্দেশ অমান্য করা চলবেনা ? এখানে তার চাকরি জুটুক বা নাই জুটুক এদের আন্তরীকতার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত রেখে তাদেরকে দুঃখ দেওয়া ঠিক হবেনা। সে তোয়ালে সরিয়ে রেখে নিজের ব্যাগ থেকে গামছাখানা বের করে নিয়ে তেল মেখে বাথরুমে গিয়ে স্নান করে এ'ল

গোকুল খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম করছে এমন সময় ধুতি পাঞ্জাবী পরা পুরু লেন্সের চশমা চোখে দিয়ে এক ভদ্রলোক ঘরে এসে চেয়ার টেনে বসলেন। গোকুল বুঝল ইনিই ভবতোষ মুখোপাধ্যায়। সে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে নমস্কার জানাতেই তিনি বললেন—বসুন, বসুন। সবতো শুনেছেন, আপনি এখানে থাকতে রাজী আছেন তো ?

গোকুল বলল—আমার থাকা না থাকা নির্ভর করছে আপনাদের দয়ার উপর। আমি খুবই মুস্কিলে পড়ে এখানে এসেছি আমাকে দয়া করে ফিরিয়ে দেবেন না।

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন আমি ফিরিয়ে দেবার কে ? যাঁর জন্য ডাকা তিনি অর্থাৎ আমার মা যখন আপনাকে পছন্দ করেছেন তখন আমি না বলার

কে? তবে ভাই আমি পয়সা-কড়ি বিশেষ দিতে পারব না। যদিও এত বড় বাড়ীটা দেখছেন কিন্তু নানা ঝঞ্ঝাটে পড়ে দারুন অর্থনৈতিক কষ্টে আছি। বাড়ীর দু'একখানা ঘর ভাড়া দিয়ে যে কিছু রোজগার বাড়াব তাতে মায়ের আপত্তি, আমার ও মর্যাদায় বাধে। আর একটা কথা হচ্ছে আমার মা একটু বেশি কথা বলেন। অনেক সময় অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথাও বলে ফেলেন আমার ছোট ভাই পরিতোষ মারা যাবার পর থেকে ওই রকম হয়েছেন। আপনাকে ভাই একটু মানিয়ে চলতে হবে :

গোকুল বলল—উনি আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। কই অস্বাভাবিক কিছু উনার কথার মধ্যে পাইনি তো? আর বয়স বেশি হলে প্রায় সকলেই কিছু কিছু বেশি কথা বলে থাকেন; এটা আমার পক্ষে কোন সমস্যা হবে বলে মনে করি না; আমি শুধু আপনার সম্মতির জন্য অপেক্ষা করে আছি। আপনি বললেই আমি থেকে যেতে রাজী আছি।

—তাহলে ভাই আপনার জিনিসগুলো নিয়ে যত শীগ্‌গির পারেন চলে আসুন, কেমন?

গোকুল বলল—ইউনিভারসিটি হোস্টেল থেকে মাত্র এক স্যুটকেস বই আর এই ব্যাগটা সম্বল করে পথে বেরিয়েছিলাম। এদেশে এসে প্রথম দিনেই বনগা স্টেশনে স্যুটকেসটা চুরি হয়ে গেছে। এখন এই ব্যাগটা ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। যা আছে সব আমার এতেই আছে।

—তবে তো কথাই নেই। আপনি তাহলে বিশ্রাম করুন, আর কোথাও যাবার দরকার নেই। বিকাল বেলা আমার স্ত্রী আপনার কাজ বুঝিয়ে দেবে। আমার সঙ্গে আবার রাত্রি ন'টার পর দেখা হবে। একটু পরে ভবতোষ বাবুর স্ত্রী এসে থাকার ঘর দেখিয়ে দিয়ে গেল। গোকুল সেখানে বিশ্রাম করতে লাগল।

১২

অবশেষে যুদ্ধের অবসান হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী সেনারা পরাজিত হয়েছে। পূর্ববাংলা পুরোপুরি মুক্তিফৌজের দখলে এসেছে। পূর্ব পাকিস্তান এখন স্বাধীন গণ-প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীন দেশের কর্ণধার। শরণার্থীদের প্রতি অতি মানবিক সাহায্য, মুক্তিফৌজকে সমর্থন ও সার্বিক সহায়তার জন্য ভারতের জনগণ ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে

বঙ্গবন্ধু আন্তরীক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। (পরবর্তীকালে তিনি ব্যক্তিগতভাবে এদেশে এসে তাঁর সে কৃতজ্ঞতা জনগণকে জানিয়ে গেছেন)।

একটি দুটি করে শিবির গুটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। দুই দেশের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় ও সরকারী ব্যবস্থাপনায় শরণার্থীরা পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর উপর অগাধ শ্রদ্ধা ও আস্থা রেখে এই প্রথম হিন্দুরা বাস্তুচ্যুত হয়েও সেই পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশেই খুশি মনে ফিরে যাচ্ছে। সেখানে মুজিব সরকার সম মর্যাদা দিয়ে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকল শ্রেণীকেই নিজ নিজ বাসস্থান ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছেন। তবে আগত সকল হিন্দুই ফিরে যাচ্ছে এমন নয়। অনেকেই বোঝার উপর শাকের আঁটির মত পশ্চিমবঙ্গের কোন জায়গায় আত্মীয় বা পরিচিতদের কাছাকাছি যে ভাবে হোক থেকে যাচ্ছে। সে ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ চিরদিনই উদার। শুধু বাস্তুত্যাগী বাঙালীদেরই নয়, বিহার উত্তর প্রদেশ গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশের অধিবাসীদের অনেকেরই বংশানুক্রমিক ব্যাণিজ্য ও বাসের দ্বৈত ভূমি এই [illegible] পশ্চিমবঙ্গ। তার ঘরের সন্তান অনাহারে কাটালেও অতিথিদের চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়র কোন অভাব নেই।

কিছুদিন পরে গোপাকে কোলকাতায় ফিরে যেতে হল। মাসখানেক হালকা ডিউটি করে এবং শুয়ে বসে কাটিয়ে অবশেষে কল্যাণী জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে তাকে জয়েন করতে হল। এখানে আর আগের মত কাজের চাপ নেই। মাঝে মধ্যে বাড়ীতেও যাওয়া যায়। সে রেলের একটা মাসিক টিকিট কাটিয়ে নিল। বীরনগর থেকে শান্তা পাল প্রতিদিন ডিউটি করলেও সমান দূরত্ব আড়ংঘাটা থেকে এসে গোপার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। কারণ ওদিকের মত আড়ংঘাটার লাইনে তেমন ট্রেনের সুবিধা নেই। বলতে গেলে গোপার চাকরির জীবন এখানে ভালোই কাটছে। কয়েকটা বছর সে বেশ আরামেই কাটাল। এমন সময় একদিন নাইট ডিউটি চলাকালীন গোপা টেলিগ্রাম পেল বাড়ীতে বাবার অসুখ। কিন্তু অত রাত্রে আড়ংঘাটা যাওয়ার কোন ট্রেন নেই। আর একা একা যাওয়াও নিরাপদ নয়।

পরদিন সকালে আড়ংঘাটা স্টেশনে নেমে গোপা দেখতে পেল মহিমের ভাই মুকুন্দ তার জন্য অপেক্ষা করছে। সে কাছে এসে বলল—দিদি তোমাকে আর বাড়ীতে যেতে হবে না, জেঠামশাইকে রানাঘাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গোপার হৃদপিণ্ড কেঁপে উঠল। সে ব্যগ্রকণ্ঠে বলে উঠল—বাবার কী অসুখ হয়েছে রে ?

মুকুন্দ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—চল, গিয়েই দেখতে পাবে। হয়তো ভালোই আছেন, এখন তুমি মন খারাপ ক'রোনা দিদি !

রানাঘাট হাসপাতালে এসে এমার্জেন্সি ব্লকের সামনে দাঁড়িয়ে গোপা কান্নায় ভেঙে পড়ল। সামনেই স্ট্রেচারে শায়ীত তার বাবা হরনাথের মৃতদেহ। তার মা সেই দেহের উপরে লুটিয়ে কাঁদছেন। কাঁদছেন মলিনা কাকীমা। গৌর কাকা প্রবোধ বাক্য দ্বারা সকলকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন। তিনি হাত ধরে বললেন—মা আর কেঁদে কি করবি, যা হবার তা তো হয়েই গেছে, যাবার সময় হলে কাউকে কি ধরে রাখা যায় ?

একথা চাকুরি জীবনে গোপা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। সময় হলে সে চলে যাবেই, কারোর জন্য কেউ অপেক্ষা করে না। তার মনে পড়ল আছিরদ্দি চাচার শরণার্থী শিবিরে মৃত্যুর কথা। তার বাবা হরনাথকে দেখার জন্য আছিরদ্দির কী প্রত্যাশা! অবশেষে হরনাথ পৌঁছানোর আগেই সে অজানা দেশে চলে গেল। এত বুঝেও বাবার প্রতি তার অভিমান হ'ল। কোন্ অপরাধে তিনি গোপাকে শেষ দেখা থেকে বঞ্চিত করে গেলেন ? সে কিছুটা শান্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—বাবার কী হয়েছিল কাকা ?

গৌর বললেন—করনারী থ্রম্বসিস। প্রথমটা আমরা বুঝতে পারিনি। বিকাল ছ'টা নাগাদ মহিম এসে খবর দিল—জেঠামশাই কেমন করছেন, বুকের ডান পাশে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি গিয়ে দেখি উনি বসার চৌকির উপর শুয়ে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। হোটেলের ঠাকুর নরেন বুকে গরম তেল মালিশ করে দিচ্ছে। বললাম, চলুন ডাক্তারখানায় যাই। উনি বললেন—থাক গে, দেখি কিছুক্ষণ তেল মালিশ করে কমে কিনা! আমি দোকানে ফিরে গেলাম। প্রায় মিনিট পয়তাল্লিশ পরে মহিম দৌড়ে এসে জানাল—জেঠামশাই অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, ডাক্তারখানায় রেখে এসেছি। আমি ছুটে যেতেই ডাক্তারবাবু বললেন—এঁকে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যান, বারবার হার্টের ভাল্‌ব ব্লক হয়ে যাচ্ছে। আমার কাছে এর চিকিৎসা নেই! তখন কোন ট্রেন ছিল না। আমি তোমাকে একটা টেলিগ্রাম করতে বলে বিজয়বাবুর কাছে গেলাম। উনাদের লরিতে তখনই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল। কিন্তু উনি পথেই মারা গেছেন। গৌরের কথা আটকে গেল। তাঁর চোখে জল

গড়িয়ে এ'ল। তিনি কাপড় দিয়ে মুছে নিয়ে পুনরায় বললেন—জরি আর ছাড়িনি, তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। শিবানীকে, দীননাথকে খবর দেওয়া হয়েছে।

লোকজন জোগাড় করে দাহ করে বাড়ী ফিরতে সকলের দুপুর গড়িয়ে গেল। বিকালবেলা দীননাথ সপরিবারে ব্রজবালাকে নিয়ে এসে পৌছালেন। তিনি আগেই জেনেছিলেন দাদার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু কাউকে জানতে দেন নি। এখন সকলে একত্র হয়ে আবার এমন ক্রন্দন রোল তুলল গৌরের পক্ষে তা সামাল দেওয়া মুস্কিল হয়ে গেল। দিনের বাকী সময় বিষাদে ও বিলাপেই কেটে গেল। অবশেষে নিশা দেবী আর্বিভূ'ত হয়ে শোক-সন্তপ্ত সকলকে ক্লান্তি ও সুষুপ্তির স্নেহ-কোলে টেনে নিলেন।

শোক বা বিষাদ যত গভীরই হউক না কেন কালের পদবিক্ষেপে তা ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসে, সহনীয় হয়। না হলে মানুষ বেঁচে থাকতে পারত না। হরনাথের বিয়োগ ব্যথাও ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে আসছে। তাই দেখা গেল শ্রাদ্ধের দিন শোকের মাঝেও সকলেই লঘুচিত্তে হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে প্রত্যেকের দায়িত্ব পালন করছে। শুধু দুটি লোক এই হাসি-ঠাট্টায় অংশ নিতে পারছেন না। তাঁরা হলেন—একজন ব্রজবালা ও অপরজন গৌরী।

সমস্ত ঝমেলা মিটে গেলে দীননাথ আরও দুটো একটা দিন থেকে স্বপরিবারে কর্মস্থল খড়্গপুরে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। যাবার সময় গৌরীকে বললেন—বৌদি, দাদা চলে গেলেও আমি আছি, এখানে গৌর আছে; আপনি কোনরকম চিন্তা করবেন না। আর গোপার জন্যও ভাববেন না। ও গুণী মেয়ে। ওকে নিয়ে কোন চিন্তা নেই। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর বিয়ের ব্যবস্থা করছি। যদিও কাল অশৌচ বলে একটা কথা আছে; কিন্তু মেয়ের বিয়ে এতে আটকায় না।

পাশেই গোপা দাঁড়িয়ে আছে। সে কাকার কথার কোন উত্তর দিল না। যমন দাঁড়িয়েছিল তেমনিই মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কাকাদের সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত গেল।

পরেরদিন শিবানীরাও চলে গেল। বাড়ীতে এখন মাত্র তিনজন নারী। গৌরী, ব্রজবালা আর গোপা। সে আরও দুই সপ্তাহ ছুটি বাড়িয়েছে। হাতে মাত্র দিনচারেক সময়। ব্রজবালা আর খড়্গপুরে ফিরে যাননি। তিনি এখন থেকে এখানেই থাকবেন। তাঁর বড়ই আপশোষ তিনি বড় হয়েও পৃথিবীর বুকে রয়ে গেলেন; অথচ চার বছরের ছোট হরনাথ—বলতে গেলে অসময়ে চলে গেল। তিনি এখনও প্রতিদিন হরনাথের জন্য চোখের জল ফেলছেন। তাঁর অবস্থা

দেখে গৌরীর স্বামীবিয়োগ ব্যথা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাধ্য হয়ে গোপাকে চুপ করে থাকতে হয়। সে দুজনকেই সান্ত্বনার কথা শোনায়।

প্রতিদিনই অন্ততঃ একটি বারের জন্য হলেও গৌর এসে খোঁজ খবর নিয়ে যান। মহিম কিংবা মুকুন্দ দোকান-বাজার করে দিয়ে যায়। এরা সকলে নিঃশব্দে অলিখিত শর্তে গৌরের অভিভাবকত্বের মধ্যে গিয়ে পড়ছে। সেদিন সন্ধ্যার পরে গৌর এলেন। বললেন—মা গোপা, এসো আমরা একটু বৈষয়িক আলোচনা করি।

গোপা মুখ তুলে বলল—বলুন আপনি।

—আমি বলছিলাম দাদা তো চলে গেলেন, এখন হোটেলটা কি ভাবে চালানো যায় সেটাই তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। হোটেলের যা মূলধন ও সম্পত্তি আছে তা আধাআধি ভাগ করলে তোমাদের প্রায় এগারো-বারো হাজার টাকা পাওনা হয়। তোমরা মনে করলে এই টাকাটা দশ বারোটা কিস্তিতে আমার কাছ থেকে নিয়ে নিতে পার। আর যদি বল তোমরা ও টাকা উঠিয়ে নেবে না, তাহলে আমি একজন বিশ্বাসী কর্মচারী রেখে তোমাদের লভ্যাংশ থেকে তার মাস মাইনা দিয়ে বাকী টাকা তোমার মায়ের হাতে প্রতি মাসে দিয়ে দেব। তোমরা যা বলবে আমি তাই করতে রাজী আছি। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে গোপার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

গোপা একটু ভেবে নিয়ে বলল—কাকা, কোনটা করলে কি সুবিধা হবে বুঝিয়ে বললে তবেই আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারব।

গৌর বললেন—আমার মনে হয়, বছরদুয়েকের মধ্যে এই এগারো-বারো হাজার টাকা তোমরা হাতে পেয়ে যাবে। অবশ্য যদি তোমাদের সত্বটা অন্যের কাছে বিক্রী করা যায় তাহলে দু'এক মাসের মধ্যেই তোমরা টাকা পেতে পার। কিন্তু আমি তা চাইছি না। যাই হোক এই টাকাটা পেয়ে তোমরা ব্যাংকে রাখলে একটা নির্দিষ্ট পরিমানে মাসে মাসে সুদ পেয়ে যাবে। অন্যটা হলে আশাকরি মাসে মাসে এর বেশি পরিমাণ টাকা তোমাদের ঘরে আসবে। আর হোটেলটার মালিকানা সত্বও তোমাদেরই থেকে যাবে। এতে ভবিষ্যতে মূলধন বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এর একটা মন্দ দিকও আছে, আমি যতদিন আছি আশা করি তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু আমার অবর্তমানে মহিম আর মুকুন্দর হাতে পড়ে মূলধন নষ্ট হয়ে গেলে, কিংবা ওরা ফাঁকি দিলে তোমরা ফাঁকে পড়তে পার মা। এখন বল তোমরা কি করতে চাও

গৌরী চিন্তা করে বললেন—ঠাকুরপো, আমাদের কপালে ফাঁকি থাকলে না-হয় তাই হবে। আপনি যেভাবে পারেন চালান, অন্য কোন লোকের কাছে আর বিক্রী করবেন না; কিংবা আমাদের অংশের টাকাও ফেরৎ দেবেন না। আমাদের এখানে যা কিছু হয়েছে সবই আপনারই জন্য। আপনিই দায়িত্ব নিয়ে যা করবার করুন।

গোপা বলল—হ্যাঁ কাকা, আমারও তাইই মত। সে গৌরের জন্য চা করতে রান্না ঘরে গেল। গৌর ব্রজবালা ও গৌরীর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। রাত্রি প্রায় ন'টার সময় গৌর গোপাদের বাড়ী থেকে চলে গেলে গৌরী ও গোপা আলোচনা করে দেখল—যে বিষয়টা নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল তার সুষ্ঠ মীমাংসা হয়ে গেল। তারা নিশ্চিন্ত হ'ল।

১৩

অবশেষে ছুটি ফুরালে মাকে ও পিসিমাকে বাড়ীতে রেখে গোপা কর্মস্থানে রওনা হ'ল। এবার তার কর্মস্থান চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণে বনাঞ্চল গোসাবা। গোপা কোলকাতা গিয়ে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে স্বপ্নার কাছে এক রাত্রি থাকল। পরের দিন সকালে উঠে সে শিয়ালদা গিয়ে ক্যানিংএর ট্রেন ধরল। ট্রেন থেকে নেমে নদীপথে লঞ্চে গোসাবা যেতে তার বিকাল হয়ে গেল। সে ভাবতে পারেনি চাকরির খাতিরে তাকে এমন জায়গায় এসে পড়তে হবে। তার বাবা বেঁচে থাকলে তিনি মেয়েকে এমন জায়গায় ছেড়ে দিতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু গোপার এখন মনে হয়—হয়তো তাকে চাকরি করেই জীবন নির্বাহ করতে হবে।

ডাক্তার বৈদ্যনাথ হাজরা হাসপাতালের সর্বময় কর্তা। পাশেই তার কোয়ার্টার—কাম বসতবাটী। তিনি হাসপাতালের গায়েই জমি কিনে বাড়ী করেছেন। যারা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসে তাদের কেউ কেউ আবার অন্য সময়ে ফী দিয়ে তাঁর বাড়ীর চেম্বারে গিয়ে দেখায়। চিকিৎসক হিসাবে এ অঞ্চলে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি। গোপা যখন আসে তখন তিনি হাসপাতালেই ছিলেন। নার্স অমলা অধিকারীকে তিনি বলে উঠলেন—এই যে অমলাদি আপনার এ্যাসিস্ট্যান্ট গোপা মিত্র এসেছেন। এ আর আপনার শত্রু হবে না, একেবারে মিত্র।

অমলা অধিকারী এই হাসপাতালের অতি পুরানো নার্স। গোপাকে দেখে

খুব আনন্দিত হয়েছেন। ডাক্তারবাবুর কথার উত্তরে তিনি বললেন—মিত্র কি শত্রু তা এখনই কি করে বলব? আগে কিছুদিন টিকুক তবে তো বুঝব! এই ক'বছরে কত এল আর গেল—আমি দেখছি আপনিও দেখছেন; সেই যে তিন বছর আগে নারকেল-সুপুরির চারা বসিয়ে এলুম, আর আপনারা আমাকে বাড়ীমুখো হতে দিলেন না। কি ভাই মিত্র দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এই চেয়ারটাতে ব'স। কষ্ট করে এতদূরে যখন এসেছ তখন সব দেখে শুনে আপন করে নাও।

গোপা অমলাদির কথায় আন্তরীকতার স্পর্শ পেয়ে চেয়ারে বসে পড়ল।

ডাক্তার বাবু মুচকি হেসে বললেন—সবুর করুন, আর কয়েকটা বছর পরে যান, তাহলে নারকেল খেয়ে একেবারে আমাদের জন্য নাড়ু বেঁধে নিয়ে আসতে পারবেন।

অমলা রেগে গিয়ে বললেন—আপনারা তো তাইই চান। ভাগ্যিস ছেলের বিয়েটা দিয়ে এসেছিলুম; নাহলে আপনারা তাও হতে দিতেন না।

ডাক্তারবাবু বললেন—না, না, ঠিক কথা বললেন না। মরা বা বিয়ের ব্যাপারে সবাই ছুটি পায়। আপনিও পেয়েছেন। ছেলে এখন বৌ নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করছে। বিধবা মা তাদের মাঝখানে গিয়ে কেন অশান্তি ঘটাবেন? এই জন্যইতো আপনাকে ছুটি দেওয়া হয় না। বলুন মিস মিত্র ঠিক করেছি কিনা?

গোপা কোন জবাব দিতে পারেনা। শুধু মুখ টিপে হাসে। আর ভাবে অমলাদির সহচার্য্যে তার দিনগুলো মন্দ কাটিবে না।

পরদিন থেকেই গোপা যথারীতি কাজে লেগে গেল। সাধারণ জ্বর-কাশি থেকে শুরু করে সাঁপে কামড়ানো, বাঘে আঁচড়ানো—এমন কি কুমীর-কামটে ধরা রুগী পর্যন্ত এখানে আসে। কখনও কখনও কোলকাতার মেডিক্যাল কলেজ থেকে বড় ডাক্তার হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন। রুগীর অবস্থা বিবেচনা করে ক্যানিং অথবা কোলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

গোপার দিনগুলো একভাবে কেটে যায়। মাঝে মাঝে মায়ের চিঠি আসে। মায়ের নিজের কথা ছাড়াও গৌর কাকাদের বাড়ীর অনেক কথা থাকে। মাসে গৌর কাকা কত টাকা দিলেন সে সবও লেখা থাকে। তিনি এখন মুড়ি-চিঁড়ের দোকানে মহিমকে বসিয়ে মুকুন্দকে নিয়ে হোটেল চালাচ্ছেন। গোপার বাবার

অবর্তমানে যে কর্মচারী রাখা হয়েছিল সে বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে তাকে বাদ দিয়ে এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

কয়েকমাস চলার পরে গোপা আবিস্কার করে হাসপাতালের নবীন ডাক্তার বিকাশ পাল যেন কোন মতলব নিয়ে ক্রমশঃ তার দিকে এগুতে চাইছে। একসঙ্গে কাজ করার সময় কথা-বার্তা, হাসি-ঠাট্টা করা স্বাভাবিক। কিন্তু তা যদি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও মাত্রাধিক হয় তবে ভাববার বিষয় বৈকি। বিধাতা বোধহয় নারী জাতিকে বিশেষ কোন ইন্দ্রিয় দিয়েছেন—যার সাহায্যে তারা আগে থেকে বুঝতে পারে—কোন্ পুরুষ তাকে কেমন ভাবে পেতে চায়, এবং সেইমত তারা সময় থাকতে সাবধান হয়।

বিকাশ প্রায়ই গোপার সঙ্গে ডিউটি নিতে শুরু করেছে। ডিউটি না থাকলে নানা অজুহাতে গোপার সান্নিধ্য পেতে চায়। এখানে-সেখানে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব রাখে। গোপা কায়দা করে পাশ কাটিয়ে যায়। বিকাশ সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ী যাওয়া আজকাল বন্ধ করে দিয়েছে। সেখানের বাসন্তী নামের মেয়েটা বোধ হয় বিকাশকে আর আকর্ষণ করতে পারছেনা।আর নতুনের প্রতি মোহ বেশিরভাগ ছেলেদেরই থাকে। বিকাশের ধারনা গোপা সামান্য নার্স মাত্র। সে বাসন্তীর খবর জানে না। কিন্তু গোপা যে একদিন অমলাদির কাছ থেকে হাসপাতালের কার কি চরিত্র, কোথায় কার ঘাঁটি—এ সকল জেনে নিয়েছে, তা বিকাশ জানে না। আর কিছুই না থাকলে সপ্তাহে সপ্তাহে বাসন্তী কুণ্ড নামের আইবুড়ো মেয়েটা বিকাশ পালকে অত চিঠি লেখে কেন?

বিকাশ গত কয়েকদিন হ'ল অনুমতি না নিয়েই গোপাকে "আপনি" ছেড়ে "তুমি" সম্বোধন করতে শুরু করেছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস—সামান্য নার্স গোপা আন্তরীকভাবে ডাক্তার বিকাশ পালের সান্নিধ্য কামনা করছে। না করার কারণ সে যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

কয়েক টা দিন পরেই দোল এসে পড়ল। এদিন গোপার ডিউটি ছিল না। বলতে গেলে কারোরই ডিউটি ছিল না। ইণ্ডোর পেশেণ্টদের দেখাশুনা, ওষুধপত্র দেওয়া সবই সাতটার মধ্যে হয়ে গেছে।

হাজরা বাবুর মেয়ে কিংবা পাড়ার চেনা মেয়েরা রং দিতে আসবে এটা ভেবে নিয়েই গোপা একটা সাধারণ পুরানো কাপড় পরে টুকিটাকি কাজ করছিল। এমন সময় বিকাশ কোন অনুমতি না নিয়েই হঠাৎ গোপার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল, তাকে জাপটে ধরে তার মাথায়, মুখে শুধু আবীর মাখিয়েই

ক্ষান্ত হ'ল না, ত্বরিতে কামুক বিকাশের লম্পট হাতদুটি উর্দ্ধাঙ্গে অনাঘ্রাত চূড়াদ্বয় নিষ্পেশনে ধাবিত হ'ল। গোপা নিজের শালীনতা রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। সজোরে তার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে বিকাশকে সামনের দিকে ঠেলে দিল। বিকাশ সে ধাক্কা সামলাতে না পেরে মেঝের উপর পড়ে গেল। দরজার চৌকাঠে লেগে তার কপাল কেটে রক্ত ঝরতে লাগল।

গোপা তাড়াতাড়ি ডেটল-তুলো চেপে ধরতে গেলে বিকাশ তার হাত সরিয়ে দিয়ে রেগে বলে উঠল—থাক অত আর দরদ দেখিয়ে কাজ নেই! ভালোবাসার যথেষ্ট মূল্য দিয়েছ, অসভ্য বর্বর কোথাকার! কুকুরের পেটে কি ঘি-ভাত সহ্য হয়?

গোপা উত্তেজিত হয়ে জবাব দিল—চুপ করুন, আর কথা বাড়াবেন না। ভগবান যা সাজা দিয়েছেন তার উপর আমি আর বেশি কিছু দিতে চাই না। তবে যদি জানতুম আপনি এমন করে অপমান করার মতলব নিয়ে আসছেন, আর ইতিমধ্যে যদি চুরির শাস্তি না পেতেন, তবে কে কুকুর তা আপনাকে ভালোকরে বুঝিয়ে দিতুম। অনেক মেয়ের তো সর্বনাশ করলেন, এবার ভদ্র হওয়ার চেষ্টা করুন! বিকাশ দরজার বাইরে পা রাখতেই সে ঘরে কবাট দিয়ে স্যুটকেস গোছাতে ব'সল। তারপর কারোর অনুমতির অপেক্ষা না রেখে লঞ্চঘাটার দিকে এগিয়ে চলল।

আজ ছুটির দিন বলে লঞ্চে বড় একটা ভিড় নেই। মেয়েদের কেবিনে মাত্র জনাতিনেক যাত্রী। একজনের কোলে একটি দুধের শিশু। কিছুক্ষণের মধ্যে লঞ্চ ছেড়ে দিল। ঘণ্টাখানেক খোলের মধ্যে থেকে গোপা হাঁপিয়ে উঠল। পায়ে পায়ে উপরে উঠে গিয়ে ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। একসময় ড্রাইভার তাকে ডেকে নিয়ে উপরে তার বসার জায়গা করে দিল। গোপা আরামে বসে নদীর এপার-ওপারের দৃশ্য দেখতে লাগল। মনে পড়ল বারো বছর আগেও সে এই দোলের দিন দেশের বাড়ীতে দোল খেলেছে। তখন সে ফ্রক পড়ত। গোকুল তাদের ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে তলতা বাঁশের পিচকারী বানিয়ে তাকে ও শিবানীকে উপহার দিত। "খুনখারাপ" রং জলে গুলে সকলকে রং দিত। কত ভক্তিভাবে সে সব পূজা হ'ত। জলচৌকির চারটে পায়ার উপরে একটি মোটা বাঁশ ফেড়ে চারভাগ করে বাঁধা হত। রঙীন কাগজে মুড়ে তাকে রাধা-কৃষ্ণের ঝুলন্ত মন্দির তৈরি করা হ'ত। সন্ধ্যা বেলায় এই মন্দিরের সঙ্গে

আড়াআড়ি এক খণ্ড বাঁশ বা শক্ত কাঠ বেঁধে পালকির মত কাঁধে নিয়ে ছেলেরা আগে-পিছু শঙ্খ, কাঁসরঘণ্টা, ঢাক ইত্যাদি সহ গ্রাম পরিক্রমা করত। গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়ে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে বলা হত 'গোপালের মা, গোপালের মা গোপাল এল ঘরে, ধান-দুর্বো দিয়ে তুমি বরণ কর তারে।" এই সময় এয়ো রমণীরা থালা ভর্তি চাল, বাতাসা, সন্দেশ, ধান দূর্বা আবীর. পয়সা ইত্যাদি এনে যুগোল বিগ্রহকে বরণ করত। জল-মিষ্টি মুখে দিয়ে দিত। সঙ্গে রাখা ধামাতে চল-ডাল ইত্যাদি ঢেলে দিত। বাতাসা মুখে দিয়ে ছেলে মেয়েদের জল পান করাত। আবীর মাখা হ'ত। এ ভাবে বাড়ী বাড়ী পরিক্রমা করে যে জিনিসপত্র পাওয়া যেত তা দিয়ে দু'একদিন পরে বালক ও দরিদ্র ভোজন হত। কত ভক্তি ও অনাবিল ভাবে সে সব পালন করা হ'ত। সেই গোকুলের সঙ্গে কি আর কোনদিন তার দেখা হবে?

মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে পৌছুতে গোপার রাত্রি আটটা বেজে গেল। তার নার্স বান্ধবী স্বপ্না এ সময় নাইট ডিউটিতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সুবিধাই হ'ল। না হলে তাকে অন্য কারো বিছানায় শুতে হত। স্বপ্না মেসে না খেয়ে নিজে হাতে রান্না করে খায়। সে গোপার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে যাবার সময় বলে গেল—হাঁড়িতে ভাত আছে, এই বাটিতে তরকারী আর ওটাতে দুধ ঢাকা দেওয়া আছে, খেয়ে নিস।

গোপা বলল—তুই কি না খেয়েই ডিউটিতে যাচ্ছিস?

—আমার কথা তোকে ভাবতে হবে না, আমার ব্যবস্থা আমি করে নেব। আমি দশটার সময় একবার আসব, এসে যেন দেখতে পাই তুই খেয়ে ঘুমুচ্ছিস! স্বপ্না ত্বরিতে বেরিয়ে গেল।

গোপা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বাথরুমে ঢুকল। সকালবেলা স্নান করে হাজরা বাবুদের বাড়ীতে কৃষ্ণঠাকুরের পুজো দিয়ে তার প্রসাদ ছাড়া সারাদিনে সে অন্য কিছুই খায়নি। লঞ্চের মধ্যে খাবে বলে সে একখানা মিষ্টি পাউরুটি কিনেছিল। কিন্তু মন ভালো না থাকায় মুখে রোচেনি, অবশেষে তা নদীর জলে ফেলে দিয়েছে। ক্যানিং থেকে ট্রেনে ওঠার পথে সস্তায় কমলা লেবু পেয়ে সে দু'টাকার লেবু কিনেছিল রাস্তায় খাবে বলে। তাও তার খাওয়া হয়নি। শরীরের উপর বেশ ধকল গেছে। শ্রান্তি দূর করা ছাড়াও মানসিক শান্তির কামনায় সে শাওয়ার খুলে দিয়ে ভালো করে স্নান করল। ভিজা কাপড় পাল্টে এসে হাঁড়ির ঢাকনা খুলে দেখল একজনের মত ভাত রয়েছে। ভাত

তখনও বেশ গরম রয়েছে। সে বুঝল স্বপ্না কিছুই খেয়ে যায়নি। তাকে রেখে তার মুখের গ্রাস খেতে গোপার বিবেকে বাধল। সে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে বিছানায় বসে একটা লেবুর খোসা ছাড়িয়ে এক এক কোয়া ভেঙে মুখে ফেলে খেতে খেতে এক সময় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এ ভাবে কতক্ষণ কেটেছে তার হুস নেই। অবশেষে স্বপ্নার ডাকে তার ঘুম ভাঙল। চেয়ে দেখল স্বপ্নার হাতে এক পাউণ্ডের একখানা পাউরুটি।

স্বপ্না রুটি খানা পাশে নামিয়ে রেখে হাঁড়ির ঢাকনা খুলে দেখে নিয়ে বলল—এই পাজি মেয়ে তুই খাসনি কেনরে?

গোপা মুখিয়ে জবাব দিল—তুই না খেয়ে ডিউটি গেলি আর আমি একা একা তোর মুখের গ্রাস কেড়ে খাব। কি ভেবেছিস আমাকে?

—ঠিকই ভেবেছিলাম, তুই ভাত খেয়ে বিছানায় ঘুমুবি, আর আমার নাইট ডিউটি, রুটি খেয়ে রাত জাগতে সুবিধা হয়—নার্সের চাকরি করে গোপা তোর নিশ্চয়ই এ অভিজ্ঞতা আছে!

গোপা সাথে সাথে জবাব দিল—আটা মেখে তৈরি রুটি আর পাউরুটি এক কথা নয় স্বপ্না! যাক্ আর ঝগড়া করে কাজ নেই, এনেছিস যখন—তখন আয় দুজনেই ভাগাভাগি করে খাই। গোপা নিজে হাতে ভাত-রুটি ভাগ করে স্বপ্নাকে নিয়ে খেতে বসল।

খাওয়ার পর গোপা না ঘুমিয়ে স্বপ্নার সঙ্গে এড্‌ওয়ার্ড ব্লকে গেল। আজকের ইন্‌চার্জ অনিমা চৌধুরি। গোপার পরিচিতা। তিনি বলে উঠলেন—এই ছুঁড়ী এত রাত্রে কার সঙ্গে আড্ডা মারতে এলি? বল্কি এতে কি মন ভরবে, না শরীরের জ্বালা জুড়োবে? যাওনা সিঁথেয় সিঁদুর লাগিয়ে বরের বিছানায়—যাতে সত্যিকারের কাজ হয়। টেনিং তো কবেই শেষ হয়ে গেছে, তবে এখনও কেন এমন রাত জেগে হাই তুলে ছট্‌ফট্ করা!

গোপার পরিবর্তে স্বপ্না বলে উঠল—ওকে নাকি কেউ পছন্দ করে না।

—দ্যাখ্ স্বপ্না আমাকে আর বকাস নে, আমি যদি ছেলে হতাম—আর আমার হাতে যদি অমন ডাঁসা পেয়ারা আসত তাহলে কি করতাম বুঝতেই পারছিস!

—তুমি যদি ছেলে হতে তাহলে তোমার কেলেসোনার কি উপায় হত অনিমা দি?

—কি আবার হত, তখন তিনি অনিমার পরিবর্তে তনিমার কুঞ্জে

গুঞ্জন করতেন। তা গোপা সুন্দরী, সুন্দরবন ছেড়ে এই নগরকাননে কি প্রয়োজনে ?

এতক্ষণ পর গোপা উত্তর দিল—সুন্দরবনের সুন্দর জিনিস একা ভোগ করতে নেই, আপনজনকে ভাগ দিতে হয়। এবার আপনার চান্স, তাই নিয়ে যেতে এসেছি। আপনাকে চিনিয়ে জানিয়ে দিতে হবে তো ?

স্বপ্না বলে উঠল—হ্যাঁ অনিমাদি, আপনি গেলেই এখন বিকাশ পাল নামে একেবারে তরুণ খেলোয়ার পাবেন।

অনিমাদি বললেন—তোরা সব দেখছি পাগল – সমানে সমান হওয়া চাই তো ? আমার জুড়ি ওই কেলেসোনা ছাড়া আর কেউ নেইরে! সামনের চারটে দাঁতই যা পড়েছে, ওই মুখে যখন হাসে তখন আমার বুকের মধ্যে যা হয় তা যদি তোরা জানতি!

অনিমাদির লাগামছাড়া মুখের সঙ্গে ডাক্তার-নার্স অনেকেই পরিচিত। কিন্তু তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও নিষ্কলুষ চরিত্রে সকলেই তার আকর্ষণ বোধ করে। রুগীরা অনিমাদির প্রসংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর সেবাপরায়নতার জুড়ি হয় না। গোপা অনেকক্ষণ গল্প করে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল।

পরেরদিন স্বপ্না প্রিন্সিপ্যাল অজয় সেনের কাছে গোপাকে নিয়ে গিয়ে সকল ঘটনা জানাল। তিনি সব কিছু শুনে গোপাকে দিয়ে দু'খানা দরখাস্ত লিখিয়ে নিয়ে নিজে তাতে ভালো করে নোট দিয়ে দিলেন। একখানা গেল হাসপাতালের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এর কাছে তিন মাসের ছুটি প্রার্থনা করে। অপরখানা গেল রাইটার্স বিল্ডিংএ স্বাস্থ্য দপ্তরে – অন্যত্র বদলি হবার আবেদন জানিয়ে। পরেরদিন গোপা আড়ংঘাটার ট্রেন ধরে দুপুরের কিছু আগে বাড়ী পৌছুল।

১৪

ভবতোষের বাবা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিহার সরকারের অধীনে জরীপ বিভাগে চাকরি করতেন। ছোট নাগপুর অঞ্চলের বিভিন্ন বন-জঙ্গল ও বিহার বাংলা সীমান্তবর্তী পাহাড় অঞ্চলে পাথর কাটার লাইসেন্স দেওয়া বিষয়ে তাঁর ক্ষমতা ছিল। ইচ্ছা করলে তিনি বিভিন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে অসৎভাবে অজস্র টাকা রোজগার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি অতিশয় সৎব্যক্তি ছিলেন। তাঁর শশুর অভয়চরণ ভট্টাচার্য্য (ন্যায়ালঙ্কার) মহাশয়ও জামাইকে সর্বদা সৎ পরামর্শ দিতেন। একসময় পরিবার ও অন্যান্য পোষ্যজনের

গ্রাসাচ্ছাদনের দায়িত্ব নিজের উপর এসে পড়ায় প্রচণ্ড আর্থিক অনটনের মুখে পড়লেন। এই সময় একজন শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে তিনি স্ত্রীর নামে লীজ নিয়ে ওমপ্রকাশ পাণ্ডে নামে এক ব্যক্তিকে দিয়ে পাথর কাটার ব্যবসা চালাতে লাগলেন। ব্যবসায়ে যখন বেশ লাভের কড়ি দেখতে পেলেন তখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজেই ঝুঁকি নিয়ে সম্পূর্ণ রূপে আত্মনিয়োগ করলেন। কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর অবস্থার অনেক পরিবর্তন হ'ল। কোলকাতায় বাড়ী হ'ল, ব্যাংকে টাকা জমা হ'ল। ছেলে মেয়েরা ভালো স্কুলে লেখাপড়া শিখতে লাগল। দিনগুলো বেশ ভালোই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে আশুতোষবাবু পঞ্চাশ পার না হতেই বৈতরণী পার হয়ে গেলেন। ভবতোষ তখন সবে আই. এস সি পাশ করে ডি. এম. এস এ ভর্তি হয়েছে। সুশীল নবম শ্রেণী আর বীণা ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে।

বাবার মৃত্যুর পরে ভবতোষ একবার ভাবল ডাক্তারী পড়া ইস্তফা দিয়ে বাবার ব্যবসা দেখাশুনা করবে। সেইমত সে বর্তমান পুরুলিয়া জেলার তুলিন গ্রামে ওমপ্রকাশের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হ'ল। ওমপ্রকাশ দিন দুই তাকে যত্ন করে রেখে তৃতীয় দিনে এই বলে বিদায় করে দিল যে—তুমি এখনও ছেলে মানুষ, লেখাপড়া করবে, লেখাপড়া নষ্ট করে বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে? বাড়ী বসেই তোমাদের পাওনা তোমরা ডাকমারফৎ পেয়ে যাবে, আশুদাদা নেই, আমি ওমপ্রকাশ তো আছি; ভাবিজীকে বলো তিনি কোন চিন্তা যেন না করেন। ভবতোষ আনন্দিত হয়ে ফিরে এসে আবার উৎসাহ নিয়ে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি পড়ায় মনোনিবেশ করল। কিন্তু ওম প্রকাশ সে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখে নি। মাসের পর মাস টাকার পরিমাণ কমতে কমতে এক সময় তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। প্রবল দারিদ্রতার মুখে পড়ে মহামায়া একবার বড় ছেলে ভবতোষকে নিয়ে ওমপ্রকাশের বাড়ীতে গেলেন এবং জেনেশুনে অবাক হলেন যে তাঁর নামে কোন লীজপত্র নেই; সবই এখন ওমপ্রকাশের নামে। বিচিত্র এই সংসার! যাকে উপকার করা হয়—সুযোগ মত সে অপকার করে তার দেনা পরিশোধ করে। বুদ্ধিমতী মহামায়া ওমপ্রকাশের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের কাছে সকল ব্যথা নিবেদন করে কোলকাতায় ফিরে এলেন।

কয়েকটা বছর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে তিনি খুবই অনটনের মধ্যে কাটালেন। স্বামীর ব্যাংকের সঞ্চয় সব নিঃশেষ হয়ে গেল। ভবতোষ টিউশানি করে ডাক্তারী পড়ার খরচ চালাচ্ছে। সুশীল আর বীণাও তেমনি করে পড়াশুনা করছে।

সুশীল স্কলারশিপ পেয়ে সার্ভে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছিল। হঠাৎ একদিন ভিড় বাসে ঝুলে বাড়ী ফেরার সময় পড়ে গিয়ে সেই বাসের পিছনের চাকায় পিষে মারা গেল। তার এই মৃত্যুর জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। স্বামীশোকে পর্যদুস্ত মহামায়াকে আবার পুত্রশোকের কঠিন শেল বুক পেতে নিতে হ'ল। বারবার মরণ এসেও তাঁর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। যোগ্যতার মাপকাঠিতে তিনি মনোনীত হতে পারছেন না। একরাশ আক্ষেপ আর আপশোষ জমছে তাঁর সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে।

অবশেষে পূবআকাশে সূর্য্য উঠেছে। ভবতোষ প্রাক্‌টিসে নেমে সংসারের হাল ধরেছে। আরো কিছু পরে এক সময় বোনের লেখাপড়া ও মায়ের দেখাশুনার প্রয়োজনেই অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে সে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। তবে একথা বলতে দ্বিধা নেই – মাধবী এ সংসারে আসার পরে দারিদ্রতা আর বাড়েনি। বরং দিনে দিনে তা কমতে শুরু করেছে।

বর্তমানে ভবতোষ হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। যাদবপুরে তার ডিস্পেন্সারী। সকাল সাতটার সময় সে বেরিয়ে যায়। দুপুরবেলা খেতে আসে। আবার তিনটে না বাজতেই সে বেরিয়ে পড়ে। ফিরতে কোনদিন রাত্রি ন'টা হয়, কোন দিন বা দশটার বেশি বেজে যায়। বৃষ্টি-বাদলের সময় আরো দেরি হয়। দু'বার তিনবার বাস পাল্টে সেখানে যেতে হয়। ভবতোষের একমাত্র ছেলে বিভুতোষ এ বছরই প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে।

গোকুল এ বাড়ীতে বেশ যত্নের সঙ্গে আছে। সকালে উঠে ঘণ্টাখানেক আর সন্ধ্যার সময় ঘণ্টা দেড়েকতুই তাকে ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করতে হয়। অন্য সময় তার কোন কাজের দায়িত্ব নেই। বাড়ীর কাজের জন্য মুরলীধর নামে এক উড়িয়া ছোকরা আছে। ইতিমধ্যে গোকুল কলেজ স্কোয়ারে সূর্যসেন স্ট্রীটে গিয়ে সত্যব্রত দত্তের সঙ্গে দেখা করে তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রাইভেটে এম-এ পড়াশোনায় যোগদান করেছে। এর পরেও তার সময় হাতে থাকে। তাই মাঝে মধ্যে বিভুতোষকে পড়ানো, বাজার করা ইত্যাদি কিছু কিছু কাজ নিজে যেচে করে।

আস্তে আস্তে বিভুতোষ গোকুলের অনুরাগী হয়ে উঠেছে। গোকুলও স্নেহের আকর্ষণে তাকে কাছে টেনে নিয়েছে। সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে বিভু গোকুলকে জড়িয়ে ধরে বলল—কাকু আমাকে একটা টিয়া পাখি কিনে দেবে? অভয়দের বাড়ীতে টিয়া পাখি আছে, কত কথা বলে—ঠিক আমরা যেমন বলি,

আমার শুনতে খুব ভালো লাগে। মানুষ নয় কিন্তু কথা বলে—কী মজা তাই না কাকু?

গোকুল উত্তর দেয়—হ্যাঁরে খুব মজা।

—দেবে কিনে ব'লো?

—আচ্ছা দেব, আর কি চাই তোমার?

—আর একটা খাঁচা। খাঁচার মধ্যে পাখিটাকে রেখে দেব বুঝেছ? নাহলে তো উড়ে পালিয়ে যাবে!

—তুমি একটি আস্ত বোকা! পাখি কিনব আর খাঁচা কিনব না—তা কি হয়? তাহলে পাখিটাকে রাখব কোথায় এ বুদ্ধি তোমার নেই?

গোকুলের কথায় লজ্জা পেয়ে বিভু হাসতে থাকে

গোকুল গত দেড় বছর এখানে থাকলেও টাকা-পয়সা দিতে গেলে সে নেয়নি। তার যখন যা প্রয়োজন পেয়ে যাচ্ছে। পরের দিন সে মাধবীর কাছে গিয়ে বলল—বৌদি আমাকে গোটাকতক টাকা দিন তো আজ।

মাধবী বলল—তোমার কত টাকা চাই?

—কুড়ি-তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ যা হোক দিন।

—কত টাকা ঠিক করে বল না—

—তাতো বলতে পারছি না, কত টাকা লাগবে···

—তুমি কি করবে?

—সেটা আমি আপনাকে পরে বলব।

—আচ্ছা। মাধবী হেসে ঘরে গিয়ে দশটাকার পাঁচখানা নোট এনে গোকুলের হাতে দিল।

গোকুল টাকাগুলো পকেটে পুরে নিয়ে বলল—আমি একটা জিনিস কিনতে যাচ্ছি; যদি ফিরতে দেরি হয় তাহলে আপনি বিভুতোষকে নিয়ে আসবেন। সে বেরিয়ে গেল। লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে করে নিউ মার্কেটে গিয়ে হাজির হ'ল। সেখান থেকে খাঁচাসুদ্ধ পাখি কিনে নিয়ে যখন বাড়ী পৌছুল তখন বিভুতোষ স্কুল থেকে ফিরে এসে জলখাবার খাচ্ছে। পাখি দেখতে পেয়ে সে খাওয়া ছেড়ে দৌড়ে কাছে এসে লাফিয়ে লাফিয়ে বলতে লাগল—কী মজা! কাকু আমার পাখি এনেছে। কী মজা! কী মজা! কাকু আমার টিয়া পাখি এনেছে। ও ঠাকুমা দেখ—কাকু আমার কেমন পাখি এনে দিয়েছে। তার নাচ দেখে সকলেই হাসতে লাগল, আনন্দ পেল। মহামায়া গোকুলের প্রসংসা গাইতে লাগলেন।

একদিন ভবতোষ একখানা কাগজ আর কলম নিয়ে গোকুলের ঘরে এসে বলল—কী সর্বনাশ! তুমি আমাকে একহাজার ছয়শো টাকা ঋণের জালে আটকিয়েছ? না গোকুল, তুমি এমন করলে তো আমি মারা পড়ব। না ভাই, টাকা পয়সার সঙ্গে কোন খাতির নেই। তুমি যদি তোমার মাইনে মাসে মাসে বুঝে না নাও তাহলে তো আমি তোমায় রাখতে পারব না ভাই!

গোকুল একটু চুপ করে থেকে বলল—যদি বলি আমি আমার পাওনা নিয়ে নিয়েছি!

—কী বললে, তোমার টাকা নিয়েছ?

—হ্যাঁ দাদা আমি নিয়েছি, আপনার হয়তো স্মরণে নেই।

—তাই নাকি? হ্যাঁ মাধবী গোকুল যে বলে সে টাকা নিয়েছে, আমার কি এতই ভুলো মন যে একবারও তা মনে করতে পারছি না?

মাধবী আর বীণা দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে। তারা কোন জবাব দেয়না। মহামায়া এগিয়ে এসে বললেন—ভবতোষ তোর এখনও আক্কেল হ'ল না, ওকে তুই মাইনে করা চাকর ভেবেছিস? মাইনে করা লোক কি কখনও এত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে?

ভবতোষের মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না। সে চেম্বারে বেরিয়ে গেল।

চৈত্র মাসের শেষের দিকে একদিন হঠাৎ ওমপ্রকাশ পাণ্ডে কেলকাতায় এলেন। এতকাল পর তাকে দেখে সকলে অবাক হ'ল। মহামায়ার মনে যতই ক্ষোভ থাক—তা প্রকাশ না করে অতিথির পূর্ণ মর্যাদায় অভ্যর্থনা জানালেন।

ওমপ্রকাশ হঠাৎ নিচু হয়ে মহামায়ার পা চেপে ধরে বলে উঠলেন—ভাবিজী হামাকে ক্ষ্যামা করুন। আপনাদের সম্পত্তি বুঝে লিন। হামি সব ছেড়ে দেবে। আমার ছেইলে বীমার আছে। কিষেনজী খোয়াব দেখাইল, সম্পত্তি না ছাড়লে ও বাঁচবেনা। আপনি দয়া করুন, খুশ হোন ভাবিজী! ওমপ্রকাশ কাঁধের ঝোলা থেকে একতাগুিল ভুয়া কাগজপত্র বের করে সকলের সামনেই তা কুট কুট করে ছিঁড়ে ফেলে পুনরায় বললেন—বিশ্ওয়াস করুন হাপনাদের আউর কোন ক্ষতি হোবে না। হামার ছেলেকে হাপনি আশীরবাদ করুন। ওমপ্রকাশের এই শুভ বুদ্ধিতে মহামায়া হাসবেন কি কাঁদবেন বুঝে উঠতে পারেন না।

সেদিন ওমপ্রকাশ কোলকাতায় রয়ে গেলেন। পরেরদিন মহামায়া

কালীঘাটে মায়ের পুজো দিয়ে ফুল-বেলপাতা এনে দিলে তাই নিয়ে ওমপ্রকাশ বাড়ী গেলেন।

কয়েকদিন পরে ভবতোষ, তার স্ত্রী মাধবী আর মহামায়ার মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল, লীজের সম্পত্তি তো হাতে আসছে কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে তার দেখাশুনা বা পরিচালনা করবে কে? ভবতোষের পক্ষে এখন প্রাকটিস ছেড়ে দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যে দায়িত্ব নিতে পারত সে কয়েক বছর আগে ইহলোক ত্যাগ করে গেছে।

মাধবী বলল—মাস্টার মশাইকে কি সেখানে পাঠানো যায় না?

ভবতোষ বলল—সে গেলে তো ভালই হয়, কিন্তু সে যে লেখাপড়ায় ব্যস্ত, তার ক্ষতি হবে যে!

গোকুলকে ডেকে কথাটা বলাতে সে বলল—এতে আমার কোনই ক্ষতি হবে না। পড়াতো আমার একরকম হয়েই গেছে, শুধু একটা পরীক্ষা বাকী। ও আমি সময় মত এসে দিয়ে যাব।

অবশেষে ঠিক হল আসন্ন অক্ষয় তৃতীয়াতে বৃন্দাবন ঘুরে এসে এই দায়িত্ব হাতে নেওয়া হবে। মায়ের মনোস্কামনা পূর্ণ করার জন্য ভবতোষ অনেকদিন ধরে চেষ্টা করে অবশেষে গতমাসে সকলের অর্থাৎ মহামায়া, মাধবী, বীণাপানি, ভবতোষ ও গোকুলের জন্য বার্থসহ রেলের টিকিট কিনে রেখেছে। বিভূতোষের জন্য দ্বিতীয় শ্রেনীতে ভ্রমণের জন্য অর্ধ টিকিট কাটা হয়েছে। সে তার মায়ের বার্থে শোবে বলে কোন আলাদা বার্থ আর সংরক্ষণ হয়নি। ভবতোষ ব্যাংকের পাশবই প্রায় শূন্য করে বন্ধু বিপিন ডাক্তারের উপর চেম্বারের ভার দিয়ে এবং সম্বন্ধি রনজিৎ ও তার স্ত্রী রমলার উপর বাড়ী দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়ে নির্দিষ্ট দিনে হাওড়া গিয়ে সকলকে নিয়ে তুফান এক্সপ্রেসে চেপে বসল।

১৫

গোপা বাড়ীতে এসেছে শুনে গৌর কাকা নিজেই দেখা করতে এসেছেন। কিছুক্ষণ কথার পরে তিনি বললেন—ভালো কথা মা হোটেলের পুরানো খাতার বাণ্ডিলের মধ্যে এই কাগজগুলো পেয়েছি। গোপা হাতে নিয়ে দেখল এগুলো পিয়ারলেস কোম্পানীতে টাকা জমার রসিদ। পরেরদিন গোপা স্থানীয় এক ফিল্ডকর্মীর সঙ্গে আলোচনা করে কৃষ্ণনগর ব্রাঞ্চ অফিসে খোঁজ নিতে গেল। জানা গেল দশ বছরের স্কীমে ন'বছর টাকা জমা পড়েছে। গত বছর খানেক কোন টাকা দেওয়া হয়নি। আগামী মাসেই বোনাস সহ নয় বছরের টাকা

রৎ পাওয়া যাবে। কোম্পানী দশহাজারের কিছু বেশি টাকা ফেরৎ দেবে। র উত্তরাধিকারী হিসাবে গোপারই এই টাকা প্রাপ্য হয়েছে। গোপা বুঝল র বাবা তার বিয়ের কথা ভেবেই নিয়মিত এই স্কীমের মাধ্যমে টাকা জমিয়ে ছন। শুধু বছরখানেক কোন কারণে টাকা দিতে পারেন নি। বাবার মৃত্যু াদ জানিয়ে নিয়ম মত সে দরখাস্ত করতে মাসখানেক পরে পিয়ারলেস ম্পানীর কাছ থেকে ডাকযোগে সে কতকগুলো কাগজ পেল। নির্দেশ মত পূরণ করে জমা করে এলে তার দিন কুড়ি পরে সে তার নামে দশহাজার শো দশ টাকার চেক পেল। ইতিমধ্যে তার নামে জমা করা পাঁচ হাজার ার ফিক্সড ডিপোজিটটা দশ বছরে বেড়ে প্রায় চৌদ্দ হাজার টাকা হয়েছে। মিলিয়ে সে এখন বাড়ী ও ব্যাবসা ছাড়া প্রায় পঁচিশ হাজার টাকার লিক। তার বাবা এসব করে রেখেছিলেন বলে গোপা অনেকখানি শ্চিন্ত হল।

একদিন গোপা মায়ের সঙ্গে যুগোল-কিশোরের মন্দিরে পূজা দিতে গেল। থেকে স্নান করে ভিজা কাপড়ে ফুলের সাজি নিয়ে সে মন্দিরে ঢুকল। সাজি ১ জুই ফুলের মালা নিয়ে কৃষ্ণঠাকুর ও রাধারানীর গলে পরিয়ে দিল। কলি ও টগর ফুল দুজনের পায়ে দিয়ে গোপা যুগল-কিশোরের সামনে মাথা য় রাখল। তার মনে মনে উচ্চারিত হল—ঠাকুব তুমি কি সত্যই পাষাণ? মনের কথা কি কিছু শুনতে পাওনা? যাকে মন দিয়ে ভালোবেসেছি ক কি এ জীবনে পাবোনা ঠাকুর? আর যদি তাকে নাই পাবো, তবে মন অন্যের প্রতি আসক্ত হয় না? ঠাকুর তুমি পাষাণ না হয়ে যদি সত্যিই ান হয়ে থাকো তাহলে আমার হারিয়ে যাওয়া আপনজনকে কাছে এনে । আর আমি একা একা এ জীবনভার বইতে পারছি না ঠাকুর!

অনেকক্ষণ পরে গোপা মাথা তুলে দেখল মন্দিরের পুরোহিত সম্মুখে াদের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন—মা আর কিছুদিন ধৈর্য্য শুভদিন আগত প্রায়, তোমার মনোস্কামনা সিদ্ধ হবে।

গোপা ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করে প্রফুল্ল চিত্তে বাড়ী ফিরে চলল।

দিন সাতেক পরে একদিন গৌর দুপুর বেলায় এসে বললেন—বৌদি তীর্থ-যাবেন? আমাদের এখান থেকে অনেক লোক গয়া, কাশী, মথুরা-বৃন্দাবনে ত যাচ্ছে। আপনি গেলে আমরা দুজনেও যাব ভাবছি।

গৌরী ব্রজবালার দিকে তাকিয়ে বললেন—কি বড়দি যাবেন নাকি ?

ব্রজবালা বললেন—ভাই এমন সুযোগ ছাড়ে কে ? হিন্দুর ঘরের বিধবার কার না সাধ যায় বৃন্দাবন ধাম দর্শন করতে, কিন্তু মা গোপা কি এত খরচ সামলাতে পারবে ?

গোপা বলল—পিসিমা তোমার চিন্তার কারণ নেই, আমাকে কিছুই সামলাতে হবে না ; তোমার ভাই যৎকিঞ্চিৎ যা রেখে গেছেন তা থেকে সামান্য কিছু নিলেই তোমার আর মায়ের ঘুরে আসা হবে। আর তোমাদের আপত্তি না থাকলে আমিও এই সুযোগ নিতে পারি।

গৌর বলে উঠলেন—এ তো অতি উত্তম কথা। তাহলে এই বুড়ো ছেলের আর কোন দুর্ভাবনা থাকে না ; স্বয়ং মা জননী সঙ্গে থাকলে আমাদের কোন বাধা বিঘ্ন আসবে না। মা আমি বলছি, তুমি চল। তোমার খরচের অর্ধেক বহন করবে এই ছেলে আর অর্ধেক বহন করবে দীননাথ। আমি কালই তাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি।

গৌরী আর গোপা আপত্তি করলেও গৌর সে কথা শোনেননি। ফলে তাদের যাত্রার দু'দিন আগে দীননাথের কাছ থেকে গোপার নামে পাঁচশো টাকার মনিঅর্ডার এল।

এই তীর্থ ভ্রমণের উদ্যোক্তা হচ্ছে বলরাম বিশ্বাস। সে প্রায়ই যাত্রী সংগ্রহ করে দেশ ভ্রমণে বের হয়। তার নির্দিষ্ট কোন বাঁধা ধরা পারিশ্রমিক নেই। তবে চাঁদা তুলে সকলে তার যাতায়াতের সমস্ত খরচ বহন করে। ফিরে আসার সময় খুশি হয়ে সকলেই কিছু কিছু পারিশ্রমিক দেয়। বলতে গেলে এটাই তার বর্তমান পেশা।

গয়ায় নেমে অনেকেই পিতৃপুরুষের পারলৌকিক ক্রিয়া সমাধা করল। ছয়-সাত ঘণ্টায় এখানের কাজ মিটে গেলে সকলে কাশীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। রাত্রি ন'টার সময় তারা সকলে গোধূলিয়া পৌঁছুল। বলরাম সকলকে হোটেলে খেতে বসিয়ে দিয়ে আশ্রয় খুঁজতে গেল। এবং প্রায় আধঘণ্টা পরে এসে শুভ সংবাদ জানাল ধর্মশালায় থাকার জায়গা পাওয়া গেছে। সে রাত্রিটা গোপারা সেখানে কাটিয়ে পরদিন সকালে সকলে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে গেল। বাবার মাথায় জল দিয়ে সকলেই মনে মনে প্রীত হল। এরপর টুকিটাকি কেনা-কাটা করে সকলেই ধর্মশালায় ফিরে এল। দুইদিন এখানে থাকার পরে

যাবার দিন গোপা বলল—কাকা আমার ইচ্ছে করছে আর কয়েকটা দিন এখানে থেকে যাই। এ দুদিনে তো এখানের বেশি কিছু দেখা হয়নি…

—আমারও তো যেতে ইচ্ছে করছে না মা, কিন্তু এরা যে আজই যেতে চাইছে।

—আচ্ছা আমরা যদি এখানে ক'টা দিন থাকি? উনারা যাচ্ছেন যান—

গৌর বলরামকে কথাটা বলায় সে বলল—আপনারা থাকাতে তো আপত্তি নেই, কিন্তু পরে কিভাবে কোথায় যোগাযোগ হবে সেটাই কথা!

—ধরো আর যদি যোগাযোগই না হয়—তাতে ক্ষতি কি?

—ক্ষতি বলতে, আপনারা যদি সব চিনে ঘুরতে পারেন তবে ভালো কথা, না হলে এই আসাটা বৃথা হয়ে যাবে, আর আমার খরচের ব্যাপারটাও…?

গোপা বলে উঠল—কাকা আমরা এখানে দিনকতক থেকে না হয় ফিরেই যাব।

গোপার কথা শুনে গৌর বললেন —তোমাকে কত দেব বলরাম?

সে কিছুক্ষণ চুপ করে মনে মনে হিসাব করে বলল—আমাকে শ'দেড়েক দেবেন।

গৌর একশো ষাট টাকা বলরামের হাতে দিয়ে বললেন—আর দেশে ফিরে দোকানে এসে চল্লিশ টাকা নিয়ে যেও, কেমন?

—আচ্ছা! বলরাম খুব খুশি হয়েছে। দুপুরের পরে তারা চলে গেল। গোপারাও এই ধর্মশালা ছেড়ে একটা হোটেলে গিয়ে উঠল।

পরেরদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে টাঙা করে সকলে সারনাথে গেল। গৌরী ভগবান বুদ্ধের চরণে লুটিয়ে পড়লেন। মায়ের দেখাদেখি গোপাও সেই মহাপুরুষের পদতল স্পর্শ করে বিক্ষুব্ধ চিত্তকে শান্ত করার চেষ্টা করল। তারপর তারা এল সেই সাধ্বী ধার্মিক মহিলা সুজতার সামনে। যিনি ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর মহামতি বুদ্ধকে পায়সান্ন ভক্ষণ করিয়ে একদিন জীবন রক্ষা করেছিলেন। তারপব সকলে মন্দির সংলগ্ন উদ্যানে জুতো-চটি ইত্যাদি হাতে নিয়ে মোলায়েম ঘাসের উপর দিয়ে পরম আরামে হেঁটে হেঁটে পরিচ্ছন্ন নির্মিত বনানী-সৌন্দর্য্যে বিভোর হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সেখান থেকে ফিরে এসে যখন তারা দশাশ্বমেধ ঘাটে দাঁড়াল তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। গঙ্গার তীরে চলমান নৌকায় এক এক করে আলো জ্বলে উঠছে। একদল মেয়ে কতকগুলো মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে জলের কুলে কুলে

সাজিয়ে দিয়ে উলুধ্বনি দিল। তারা যখন উপরে উঠে এল গোপা দেখল এরা সকলেই বাঙালী। সম্ভবতঃ এখানেরই বাসিন্দা। গোপা এখানে কয়েকদিন থেকে বুঝেছে বারোমাসে তের পার্বণ নয়—কাশীতে দিনে হাজারো পার্বণ। সন্ধ্যার অন্ধকারে কিছুক্ষণ গঙ্গার তীরে আলোর অলংকারে ভূষিত গঙ্গার শোভা দেখে ফিরে আসার সময় এক জায়গায় দেখা গেল একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাগবৎ পাঠ করছেন। সেখানে একটু দাঁড়াতেই ভিতর থেকে একজন সাধু এসে সকলকে বসতে অনুরোধ করলেন। গোপার পিসিমা এতে আনন্দিতই হলেন। সকলে ভিতরে গিয়ে বসল। রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত ভাগবৎ পাঠ শুনে তারা হোটেলে ফিরে এল।

পরেরদিন গোপারা আগ্রার উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল। উদ্দেশ্য বিশ্ববিখ্যাত তাজ মহল দেখা। ভারত সম্রাট শাহ্‌জাহানের অবিনশ্বর কীর্তি প্রানাধিক প্রেয়সী মমতাজ বেগমের স্মৃতি সৌধ। গোপার আশা ছিল জ্যোস্নার আলোয় এই ঐতিহাসিক সৌধ দেখবে। কিন্তু এখন কৃষ্ণপক্ষ চলছে। শেষ রাত্রির দিকে চাঁদ উঠছে। পরের দিন দুপুরের পরে গিয়ে ঘণ্টা তিনেক ধরে বিভিন্ন কক্ষে ঘুরে ঘুরে এক সময় ক্লান্ত হয়ে সকলকে একটু দূরে রেখে গোপা যমুনার তীরে বসল। দিনের পর দিন পরিক্রমা করে যে সৌন্দর্য্যরাশি শেষ করা যায়না—মাত্র তিন ঘণ্টায় তার কতখানি দেখা যায়? গোপা শুধু উপলব্ধি করার চেষ্টা করে সেই মহান ব্যাক্তির কথা। যিনি এত বড় দেশের সম্রাট হয়েও তুচ্ছ এক নারীকে হৃদয়ে ভালোবাসার রাজপ্রাসাদের উচ্চতম সোপানে ঠাঁই দিয়েছিলেন। তার হৃদয় মথিত করে গানের কলি মঞ্জরিত হয়ে ওঠে:—

তুমি আছ মম অন্তরে।
নাহি প্রকাশ বাহিরে॥
রাখিয়া সেথায় সংগোপনে,
আমি করি গো পূজন যতনে;
সাজাইয়া প্রণয় কুসুমে—
নীরবে, থরে বিথরে॥
জান যদি মনে এ বারতা,
ভাঙাও প্রানের নীরবতা;
সুমুখে প্রকাশি কহ কথা—
থেকো না গো দূরে স'রে॥

গান শেষ হলে গোপা তাকিয়ে দেখল ডান দিকে হাত পঁচিশ-তিরিশ দূরে একটি পরিবার এসে দাঁড়িয়েছে। পুরুষদের মধ্যে বয়স্ক যিনি তিনি ক্যামেরা বাগিয়ে ধরেছেন। অল্প বয়স্ক যুবকটি বৃদ্ধা মহিলাকে নিয়ে সামনের দিকে ধীরে ধীরে হাঁটছে। অবিবাহিতা এক তরুণী বিবাহিতা বৌটির হাত ধরে আছে। ছোট ছেলেটি তাদের মাঝখানে বিশেষ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়েছে। গোপা বুঝল ছবি তোলার প্রস্তুতি। এদের পোষাক পরিচ্ছদে বুঝতে অসুবিধা হয় না এরা বাঙালী। সে আগ্রহ ভরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে। তার পর এক সময় গৌর কাকার ডাক শুনে সেখান থেকে উঠে আসে। সকলে হোটেলের পথে হাঁটতে থাকে।

পরের দিন মথুরা স্টেশনে নেমেই বোঝা গেল এখন বৃন্দাবনে অত্যাধিক জনসমাগম হয়েছে। অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে যে বৃন্দাবনে মেলা বসে সেটা কারোরই জানা ছিল না। অবশ্য ট্রেনে ভিড় দেখে তারা এমন কিছু আন্দাজ করে ছিল। বাসে কোন জায়গা না পেয়ে তারা প্রাইভেট গাড়ী ভাড়া করল। ভেবে ছিল এই পাঁচজনকে নিয়েই গাড়ী ছেড়ে দেবে। কিন্তু তা হ'ল না। আরও জনা-চারেক তাদের মধ্যে গাদাগাদি করে ভরে নিয়ে তবেই গাড়ী ছাড়ল। বৃন্দাবন ধামে এসে তারা যেখানেই যায় দেখে লোকে লোকারণ্য। মূল বৃন্দাবনে কোন আশ্রমেই তারা আশ্রয় পেল না। হোটেলগুলোতেও জায়গা নেই। যে দুটো একটা নিম্নশ্রেনীর হোটেল ব্যবসায়ী নিজের তাগিদে জায়গা দিতে চায় সেখানের খাওয়া দাওয়া বা পায়খানা-প্রস্রাবখানার অবস্থা দেখে-শুনে থাকতে প্রবৃত্তি হয় না। সকলে যখন দিশেহারা হয়ে পড়েছে, তখন গৌর খবর আনলেন--কেশীঘাটের ওপারে গৌরীয় আশ্রমে কয়েকজন যাত্রী যাচ্ছে—সেখানে নাকি আরামে থাকা যাবে। তারা প্রথমে খানিকটা হেঁটে অবশেষে রিক্সায় উঠে কেশীঘাটে গেল। তারপর ভাসমান বয়ার উপর দিয়ে পার হয়ে সকলে যমুনার ওপারে গেল। আরও মিনিট পাঁচ-ছয় হেঁটে আশ্রমে পৌছাল। আশ্রমের বাবাজীর করুণায় গোপারা আলাদা একখানা ঘরে আশ্রয় পেল। একজন বৈষ্ণবী ঘরের মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে সকলকে বসতে দিল। ছোট টালির ঘরের পিছনের দুটো জানালা খুলে দিতেই যমুনার শীতল হাওয়ায় তাদের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তারা সকলেই যমুনার জলে স্নান করতে গেল। ট্রেনে তাদের তেমন তৃপ্তি করে স্নান হয়নি। বৈশাখ মাসে যমুনায় তেমন জল নেই।

মাথা-জল, বুক-জল, কোথাও অতল নেই। এতেই সকলে তৃপ্ত হল। ফিরে গিয়ে আশ্রমের প্রসাদ—অর্থাৎ নানাজাতের চাল-ডাল, তরি-তরকারী সমন্বিত খিচুড়িভোগ ভক্ষণ করে উদরের ক্ষন্নিবৃত্তি করল। অসময়ে এলেও তাদের ভাগ্য ভালো যে আজ আশ্রমে মধ্যাহ্নের অন্নভোগে কিছু উদ্বৃত্ত হয়েছিল। খবরটা জেনে গৌর মন্তব্য করলেন-"সবই বৃন্দাবন চন্দ্রের মহিমা।"

আহার সমাপ্ত করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেই দিনমনি অস্তাচলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে আশ্রমের মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা-বেজে উঠল। রাধা-কৃষ্ণ, গৌর-নিতাই সকলের সন্ধ্যা আরতি শুরু হ'ল। গোপারা সকলে মন্দির প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে আনন্দ আস্বাদন করল।

পরেরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই গোপার কর্ণগোচর হল মন্দিরে মধুর সংকীর্তন হচ্ছে। ইতিমধ্যে কাকা-কাকীমা, মা-পিসিমা সকলেই শয্যা ত্যাগ করেছেন। সম্ভবত: মন্দিরে গেছেন। সেও চোখে-মুখে জল দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গনে গিয়ে দাঁড়াল। আজ অক্ষয় তৃতীয়া। বৃন্দাবনের পক্ষে এটা বিশেষ উৎসবের দিন। ওপারে অনেক জায়গায় মেলা বসেছে।

প্রভাত আরতি শেষ হলে তারা সকলে যমুনা পার হয়ে মূল বৃন্দাবনে প্রবেশ করল। তারপর একসময় তারা হাঁটতে হাঁটতে শ্রীধাম বৃন্দাবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবস্থান শ্রীশ্রী রাধা গোবিন্দজীউর মন্দির দেখতে গেল। প্রথমে তারা পুরানো গোবিন্দ মন্দিরে নিতাই-গৌরকে দর্শন করে অবশেষে নূতন মন্দিরে এল। তারা রাধাগোবিন্দ বিগ্রহকে প্রদক্ষিণ করে সন্মুখে এসে ভূমিতে মাথা রেখে ভক্তি ভরে প্রনাম করল। মন্দিরের পূজারী সকলকে চরনামৃত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। মনোহর মূর্তি দেখে কত ভক্ত ভক্তিবারি বিসর্জন করছেন। আজ গোপা তার চক্ষুকে সার্থক করল। সে বুঝতে পারল কেন মানুষ দূর-দূরান্তর থেকে এত টাকা পয়সা খরচ করে এখানে ছুটে আসে! সুমুখের ওই বিগ্রহ যে ধাতুতেই নির্মিত হউকনা কেন গোপার স্থির বিশ্বাস, ওতে প্রাণ আছে। না হলে তার দৃষ্টিকে, অন্তরাত্মাকে এমন আকর্ষণ করছে কেন? সে শ্রীভগবানের প্রতীক বিগ্রহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তন্ময় হয়ে যায়। তারপর সকলের সঙ্গে প্রাঙ্গনের সানের উপর বসে বিশ্রাম নেয়। এই সময় প্রায় ষাট-সত্তর জনের একটি দল এসে কিছুক্ষণ মধুমাখা হরি-সংকীর্তন করতে থাকে। সম্ভবতঃ এরা পশ্চিমবঙ্গ থেকেই এসেছে। আবার তারা প্রাচীন মন্দিরে

ফিরে আসে। মন্দিরের স্থাপত্য-কলা দেখতে থাকে। অতীতে কত কিছুই ঘটে গেছে এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে। গোপা মনে মনে সে সব পর্যালোচনা করে। মন্দির সংলগ্ন বাগানের পাশে গিয়ে গোপা দেখতে পেল সেদিন আগ্রায় দেখা পরিবারটি ঘাসের উপর বসে বিশ্রাম করছে। এখন সে নিশ্চিত ওরা বাঙালীই। যুবকটি আজ ধুতি-পাঞ্জাবী পরেছে। অন্য সকলে বিশ্রাম করলেও যুবকটি বাচ্চা ছেলেটার সঙ্গে "কানামাছি" খেলেছ। সে বারবার চোখ বাঁধা ছেলেটার কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছে। গোপা দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখে না হেসে পারছে না। তাদের খেলা দেখে গোপা কিছুক্ষণ পরে ওপাশে গিয়ে জানল গৌর কাকা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন। গোপা না বসে সেও গৌর কাকাকে খুঁজে বের করতে নতুন মন্দিরের দিকে গেল। কিন্তু বেশি দূর এগুতে হ'ল না—দেখতে পেল কাকা ফিরে আসছেন। এবার সকলে আশ্রমে ফিরে চলল।

বিকাল বেলা সকলে যমুনা পার হয়ে বৃন্দাবনে মেলা দেখতে এসেছে। বঙ্কু-বিহারী মন্দিরের অনতিদূরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে এই মেলা বসেছে। মেলার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একসময় গোপা দল ছাড়া হয়ে পড়ল। তারপর কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর বঙ্কু বিহারীর মন্দিরে গিয়ে সে সকলের দেখা পেল। সকাল বেলার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে একা একা ঘোরাঘুরি করার মা জন্য গোপাকে বকুনি দিল। সকলে বিহারীজীকে দর্শণ ও প্রনাম করে আশ্রমে ফিরে গেল।

পরেরদিন রাধাকুণ্ডে গিয়ে একটা মজার ব্যাপার ঘটল। কুণ্ডে স্নান করে সকলে রাধারাণীর মন্দিরে গিয়ে ভক্তিভরে প্রনাম করল। কথিত আছে রাধা-রানীর কাছে প্রার্থনা করলে তা পূরণ হয়। গৌর কাকা কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে সকলেই মনে মনে রাধারাণীর কাছে মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করল।

ব্রজবালা এই সময় জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা গৌর এখানে বনের মধ্যে নাকি এখনও শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শোনা যায়?

—আমিও সেই রকম শুনেছি দিদি।

তারা কি একটা আশা করে বড় রাস্তা ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলের পথে এগুতে থাকে। জঙ্গল হলেও হাঁটতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর হঠাৎ মলিনা কাকী বলে উঠলেন—এ কী শুনছি গো?

সকলে উৎকর্ণ হয়। শোনা যায় বাঁশির মিষ্টি সুর ভেসে আসছে। সকলে

জোরে জোরে পা চালায়। এক সময় তারা একটা জলাশয়ের তীরে এসে দাঁড়ায়। দেখতে পায় জলাশয়ের অন্য পাড়ে কদম গাছের তলায় বসে এক যুবক বাঁশিতে সুর সংযোজন করেছে। তার দশ পনের হাত দূরে একজন ভদ্রলোক, দু'জন কম বয়সী মহিলা; একজন বৃদ্ধা ও একটি ছোট ছেলে ঘাসের উপর বসে একমনে বাঁশি শুনছে।

মলিনা হেসে বলে উঠলে—ওই দ্যাখো তোমাদের কৃষ্ণ ঠাকুরকে!

তাঁর পারিহাসে সকলে হাসলেও হাসতে পারছেনা একমাত্র গোপা। তার মনের মধ্যে তখন কিশোর কৃষ্ণ যৌবনের মুরলিধর হয়ে বিচরণ করছে। সে অনিসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে বারবার চেয়ে চেয়ে দেখছে পারিচিত জনের কোন নিদর্শন খুঁজে পায় কিনা। এক সময় তার ভাবনার সূত্রে টান পড়ে। দেখে সকলে ফিরে যাবার উদ্যোগ করে তাকে ডাকছে। সে অপ্রসন্ন চিত্তে সে স্থান ত্যাগ করে চলতে থাকে।

সেদিন আশ্রমে ফিরে রাত্রে গৌরকাকা দেশে ফেরার কথা তুলতে গোপার মন তাতে সায় দিলনা—সে আরও কিছুদিন এখানে থেকে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। কিন্তু গৌর কাকার উপায় নেই। একটা চালু দোকান ও হোটেল ছেলেদের উপর ফেলে রেখে তিনি নিশ্চিন্ত বেশিদিন বিদেশে থাকতে পারেন না। তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে দু'একদিন পরেই ফিরে যাওয়ার মনস্থ করলেন।

পরেরদিন সকালে গৌর আশ্রমের বাবাজীকে বললেন—বাবাজী যদি অপরাধ না নেন, তাহলে, বলি আজ আমার কিছু খরচ করার ইচ্ছা আছে—যাতে দুপুরের প্রসাদটা একটু মুখরোচক হয়।

বাবাজী কথাটা শুনে হাসলেন। তারপর বললেন—আমি তো কিছু চেয়ে নিতে পারব না। রাধাগোবিন্দের সেবায় কিছু দেবার হলে ওই প্রানামীর বাক্সে দাও। আর ভক্তদেরকে কিছু ভালোমন্দ খাওয়ানোর মন হলে নিজে হাতে কর। তুলসীদাসীকে বল, সে তোমাকে হিসাব করে বলে দেবে কেমন কি খরচ করতে হবে।

গৌর তুলসীদাসীর দেওয়া হিসাব থেকে কিছু বেশি ধরে পুরো দু'শো টাকার দই-মিষ্ট আনালেন। প্রনামীর বাক্সে একশো একটাকা ঢুকিয়ে দিলেন।

একদিন রাত্রে ব্রজবালা জানালেন, এখানে এই আশ্রমে তাঁর থেকে যাওয়ার ইচ্ছা। তিনি জেনেছেন ধনি-দরিদ্র নির্বিশেষে অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধা, বিধবা এমন কি

তরুণীরাও এখানের কোন না কোন আশ্রমে রয়ে গেছেন। কেউ বা সরকারী পেনসন ভোগী। কেউবা মাসে মাসে ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-আত্মীয়ার কাছ থেকে মাসোহারা পাচ্ছেন; কেউ বা সে সব না নিয়ে এখানে স্বইচ্ছায় ভিক্ষাজীবন যাপন করে মনের শান্তি খুঁজছেন। গৌর ব্রজবালার অভিপ্রায় জেনে প্রথমে আপত্তি করলেও পরে তাঁকে সমর্থন করলেন। পিসিমাকে ছেড়ে যাওয়ার আগে গোপা কয়েকটা দিন এখানে থেকে যেতে চায়। অগত্যা পরের দিন গৌর আর মলিনা দেশে ফিরে গেলেন। বাড়ী থেকে সকলেরই মনে হয়েছিল চেনা মানুষ সঙ্গে না থাকলে দূরের পথে চলা যাবেনা। এখন গোপা দেখল এটা কোন সমস্যা নয়। সর্বত্রই সাথী মিলছে, হৃদ্যতা গড়ে উঠছে, এক সময় তারা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। পরিবর্তে আসছে নূতন কেউ। তীর্থের পথে চাই শুধু অর্থের জোগান আর মানসিক বল।

গৌরীদেবী এখানে বেশ আনন্দেই আছেন। আশ্রমে সকাল-সন্ধ্যা হরিনাম কীর্তন শুনছেন, মহাপ্রভুর খিঁচুড়ি ভোগে ক্ষুধা নিবৃত্তি করছেন। আর মাঝে-মাঝে বৃন্দাবনের বিভিন্ন মন্দির, কুঞ্জ, বন ইত্যাদি ঘুরে ঘুরে দেখছেন। এখানে প্রত্যুষেই খোল-করতালের আওয়াজে নিদ্রা ভেঙে যায়। প্রভাত আরতির শেষে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা মাধুকরীতে বেরিয়ে যায়। বেলা নয়টা দশটার পর থেকে সকলে একে একে ফিরে আসে। যমুনার জলে অবগাহন স্নান করে বিভিন্ন অঙ্গে তিলক ধারণ করে। সন্ধ্যা-আহ্নিক সমাপনে অন্নভোগে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। অপরাহ্ণ পর্যন্ত চলে বিশ্রাম অথবা গীতা, ভাগবৎ, রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ। বেলা পড়লেই ঠাকুরের সন্ধ্যা আরতির যোগাড় চলে। কেউ ঘসে চন্দন, কেউ যায় দূর্বা তুলতে, কেউ কেউ বসে মালা গাঁথতে। নিত্যপূজার জন্য আছে আশ্রমের পিছনের দিকে যমুনার পাড়ে ফল ও ফুলের বাগান। মাধুকরী ছাড়াও বাগানে ফল—ফুল, শাক সব্জি উৎপাদনে ঠাকুরের সেবা মনে করে অনেকেই অংশ নেয়।

প্রত্যহ বেলা পড়ে এলে গোপা যমুনার ধার দিয়ে বেড়াতে বের হয়। সঙ্গে কোনদিন মা বা পিসিমা থাকেন, কোনদিন বা আশ্রমের কোন অল্প বয়স্ক বৈষ্ণবী কেউ থাকে। আবার কোনদিন সে একাই বের হয়। আজ সে একা বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কেশীঘাট থেকে অনেকটা দূরে চলে গেল। একটা পছন্দ মত জায়গা পেয়ে সে বসে পড়ল। এখানে যমুনা চওড়া হলেও মাঝখানে মাত্র হাত পঞ্চাশেক জায়গায় অগভীর জলের অবস্থিতি।

মিনিট পাঁচেক পরে তার নজরে পড়ে সেই রাধা কুণ্ডে দেখা পরিবারটি ওপারে যমুনার ধার দিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। খানিকটা এগিয়ে এসে তারা একটা সুবিধা মত জায়গায় ব'সল। কিছুক্ষণ তারা চুপচাপ বসে রইল। তারপর যুবকটি খানিকটা সরে এসে জলের দিকে মুখ করে বাঁশিতে সুর সংযোজন করল। সকলে তন্ময় হয়ে বাঁশি শুনছে। এপার থেকে গোপাও সেই বাঁশির সুর শুনতে পাচ্ছে। সে হারিয়ে যাচ্ছে ছোটবেলার স্মৃতির পথে। বিচরণ করছে বোসেদের পুকুরের পাড়ে। প্রায় আধঘণ্টা পরে বাঁশি থামলে বৌটি এগিয়ে এসে যুবকটিকে বলল—ঠাকুরপো তোমার দাদা বলছে, যে গানটা বাজালে সেটা তুমি মুখে গাও।

—শুধু গলায় ভালো শোনাবে না তো বৌদি!

—তুমি গাও তো, ভালো-মন্দ আমরা বিচার করব!

যুবকটি একটু চুপ করে থেকে অবশেষে গান ধরে—

আজো ভুলিনি তোমায়।
কত কথা, কত স্মৃতি গাঁথা
সবি মনে পড়ে যায়॥
সেদিন খেলার ছলে,
সেই বকুলের তলে,
তোমার হাতের গাঁথা মালা প'রে—
আজো কেন কাঁদি এ ব্যথায়॥
সেই ঝরা বকুল বরিষণে,
যা কয়েছিলে মোর কাণে,
আজো তা রেখেছি স্মরণে—
তবু নয়নে হায়! বারি বয়ে যায়॥

গোপা শ্রবণ ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে ভাবতে থাকে কে এই ব্যক্তি? এ যে তাদের কথাই গানের মধ্যে ব্যক্ত করছে? গোকুল ছাড়া কে এসব কথা বলতে পারে? তাকে কে বলে দেবে ওই যুবকের সত্য পরিচয় কী? সাথের অন্যান্য সকলের সঙ্গে যুবকের সম্পর্কই বা কী? তার ইচ্ছা হল এখনই ওপারে গিয়ে সে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু এখানে যে কোন পারাপারের ব্যবস্থা নেই! এখান থেকে চিৎকার করে কথা বলাতেও অশোভন হয়। গোপা

পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে দেখল বেলা ডুবে গিয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। সে দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে আশ্রমে ফিরে এল। সে রাত্রে তার কিছুতেই ঘুম এল না। দুই চোখের পাতা এক করলেই তার সামনে এসে দাঁড়ায় একবার কিশোর কৃষ্ণের মূর্তি, পরক্ষণে এই যুবকের মূর্তি। পরদিন থেকে সে এপার বাদ দিয়ে ওপারে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

দিন চারেক পরের কথা। গোপা মা আর পিসিমাকে সঙ্গে করে রাধেশ্যাম মন্দির দেখতে গিয়ে ছিল। সেখান থেকে ফেরার পথে তারা রাধা দামোদর মন্দিরে গেল। সেখানে শুধু অপরূপ বিগ্রহকেই তারা দেখল না, দেখল বাংলা ভাষায় লেখা বহু প্রাচীন পুঁথি। গোপার নিজের এ সকল কাজে লাগুক না লাগুক সে পুলকিত ও গর্বিত হয়।তাঁদেরকে স্মরণ করে—যাঁরা কত দুর্বিপাকের মধ্যে পড়েও নিরলস প্রচেষ্টায় দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে যত্নসহকারে সুন্দর হস্তাক্ষরে এগুলি রচনা করে গেছেন—যাতে পরবর্তী কালের মানুষদের কাজে লাগে।

প্রায় ঘন্টাখানেক পরে মন্দির চত্বর থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে তারা দেখল পথের পাশে গাছের তলায় বেশ কিছু লোক এক বৈষ্ণবীর গান শুনছে। গোপারাও সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। এবার বৈষ্ণবী একতারা বাজিয়ে নেচে গান ধরল :—

আমার কৃষ্ণ কোথায় রে
আমার কৃষ্ণ কোথায় রে ;
সর্বখানে খুঁজে বেড়াই—
বৃন্দাবন মাঝারে।
ও সই বৃন্দে —
আমি আর করবনা তোর নিন্দে।
কোথায় আমার প্রানের কৃষ্ণ
খুঁজে দে আমারে।
সই কৃষ্ণ বিহনে,
এ জীবন রাখি কেমনে ?
সে আমার সব নিয়েছে
তবু দুখ দিয়ে সে গেছে যে সরে।

গান শেষ হলে গোপা বৈষ্ণবীর হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিল বাইরে গান থামলেও থামল না গোপার মনে। মনের গহীন সলিলে গানে কলিগুলো উত্তাল সমুদ্রের ঢেউএর মত দাপাদাপি করতে লাগল। বেলা বাড় দেখে গোপা মাকে আর পিসিমাকে আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে একা একা উন্মাদি রাধার মত বৃন্দাবনের পথে পথে অন্বেষণ করে বেড়াতে লাগল গোকুলক কৃষ্ণকে খুঁজে পায় কিনা। এক সময় সে বঙ্কুবিহারীর মন্দিরের কাছাকা মেলার মধ্যে এসে পড়েছিল। খানিকটা এগিয়ে তার চোখে পড়ল— ঈপ্সিত সেই যুবক বাচ্চা ছেলেটার হাত ধরে একটা দোকানে দাঁড়িয়ে পুতু কিনছে। তার লাগোয়া অন্য দোকানে বিভিন্ন ধাতুর দেবদেবীর বিগ্রহ আশায় উৎফুল্ল হয়ে গিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সকল সংকোচ কাটিয়ে গোপা বলে উঠল—আপনি কি বাঙালী ?

যুবক তার দিকে দেখে নিয়ে বলল—হ্যাঁ, কেন বলুন তো ?

—আমি একটা পিতলের রাধাকৃষ্ণ নেব, আপনি একটু দাম করে কি দেবেন ?

—আচ্ছা দিচ্ছি। যুবকটি কেনা পুতুলের দাম মিটিয়ে দিয়ে একটু বাঁ দি সরে গিয়ে অন্য দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গোপার পছন্দ মত মূর্তিটার দা করছে এমন সময় গোপার সমবয়সী মেয়েটি ছুটতে ছুটতে এসে বলল—মাষ্টা মশাই শীগ্‌গির চলুন ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেরি হলে ট্রেন পাওয়া যাবে না।

—আচ্ছা যাচ্ছি। যুবকটি গোপার দিকে ফিরে বলল—ক্ষমা করবেন আমি অপনার কোন উপকার করতে পালরাম না, আপনি একটু দাম করে নিয়ে নেবেন, ওরা খুব বেশি ঠকাবেনা—

"দেখিয়ে দোকানদারজী দিদিমনিকা ঠকাইয়ে মত"। যুবকটি দ্রুতপায়ে চলে গেল।

হায়রে! যুবকটি গোপাকে কি অতই তুচ্ছ মনে করল, যে সামান্য ক'টা পয়সা বাঁচানোর জন্য সে যুবকের সাহায্য প্রার্থী হয়েছিল ? গোপা বোবার মত তার চলে যাওয়া দেখল। মূর্তি কেনার সময় কথাবার্তার মাধ্যমে সে যুবকটির পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার সকল আশা ভরসা নির্মূল হয়ে গেল। হাতে ধরা সেই রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের উপর তার বড়ই অভিমান হ'ল। সে বিগ্রহকে দোকানে নামিয়ে রেখে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দোকানীর কথায় কোন কর্ণপাত না করে অপ্রসন্ন মনে আশ্রমে ফিরে চলল। আর তার

াবনে থাকার ইচ্ছা নেই। তার মন তখন বৃন্দাবন-মথুরা ছাড়িয়ে রেলের
াবায় কামরায় খুঁজে ফিরছে একটি মুখ।

দু'দিন পরে পিসিমাকে থাকার সকল ব্যাবস্থা করে দিয়ে গোপা মাকে
হ অন্য একদল যাত্রীদের সঙ্গে দেশে ফিরে আসছে। পথে এলাহাবাদে তারা
ম পড়ল। ত্রিবেণী সঙ্গমস্থল দর্শন করল। সেখানে স্নান করে কয়েকদিন
ান করতে গোপার মন অনেকটা শান্ত হ'ল।

কালকা মেল প্রচণ্ড গতিতে হাওড়ার দিকে ছুটে চলেছে। বিকাল বেলা
াহাবাদ থেকে গোপা গাড়ীতে চড়েছিল। রাত্রি ন'টার সময় মোগল-সরাই
ানে খাওয়া দাওয়া করে মাঝের বার্থে শুয়ে পড়ল। তার মা গৌরী দেবী
ছেন নিচের বার্থে। পাশের কয়েকটা বার্থ খালি পড়ে রয়েছে। সম্ভবতঃ
র্তী কোন স্টেশনের যাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। প্রথম দিকে ঝাঁকুনিতে
াব ঘুমের ব্যাঘাত হলেও এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ল। রাত্রি দেড়টা
াদ তার ঘুম ভেঙে গেল। বার্থরুম থেকে ঘুরে এসে আর সে ঘুমুতে পারল
মৃদু আলোয় সে চেয়ে দেখল সেই পরিবারের সকলে আশে পাশে ঘুমুচ্ছে।
কোথা থেকে কখন উঠেছে গোপা বুঝতে পারেনি। তার সামনা-
নি অন্য মাঝের বার্থে সেই যুবক ঘুমুচ্ছে। উপরের বার্থে স্বাস্থ্যবান সেই
লাক। গোপার মায়ের সামনের নিচের বার্থে বৌটি ও বাচ্চা ছেলেটা
চ। কিন্তু সেই মেয়েটা বা বৃদ্ধাকে এখানে দেখা যাচ্ছে না। সম্ভবতঃ
াকাছি কোথাও রয়েছে। গোপা কিছুতেই নিজের দৃষ্টিকে সামাল দিতে
ছ না। বারবার ঘুমন্ত যুবকের মুখ-মণ্ডল পরিক্রমা করছে। এক এক-
মনে হচ্ছে তার হাতখানা ওর যুবকের কপালের উপর রাখে, কিংবা
স্বন সুদৃশ্য চুলের মধ্যে তার আঙ্গুল পুরে দেয়। মনে হচ্ছে ওই যুবক যদি
উঠে বসত তাহলে তার সঙ্গে গল্প করে সে রাত্রি ভোর করে দিত। গোপা
ঘণ্টা খানেক এ পাশ ও পাশ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের আগে
করল ভোর হলেই সে তার কৌতূহল চরিতার্থ করবে। এরা নিশ্চয়ই
া পর্যন্ত যাবে।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লেট করে গাড়ী আসানসোল এসে দাঁড়িয়েছে। ঘুম
গোপা নিরাশ হল। বৌটিও ছোট ছেলেটি ছাড়া যুবকটি ও ভদ্রলোক
গোপা ভাবল হয়তো খাবার কিনতে তারা প্লাটফরমে নেমেছে। গোপা
ঘুম যাওয়ার আগে মাকে ঘুম ভাঙিয়ে প্লাটফরমে নামল কিছু খাবার কেনার

উদ্দেশ্যে। প্রায় মিনিট কুড়ি দাঁড়িয়ে থাকার পর গাড়ী আবার চলতে শুরু করেছে। সে দেখল বৌটি ও ছেলেটা এখানে নেই। খানিক পরে বাথরুম থেকে ফিরে আসার পথে সে লক্ষ্য করল মেয়েদের খোপে সেই পুরুষ দুই জন ছাড়া সকলেই রয়েছে। পুরু লেন্সের চশমা পরা মেয়েটা ইশারায় ডাকতে গোপা হাতের সাবান-তোয়ালে দেখিয়ে বলল—এগুলো রেখে আসছি।

গোপা ফিরে এলে মেয়েটি তাকে পাশে বসিয়ে বলল—আপনারা বৃন্দাবন থেকে আসছেন তো?

হ্যাঁ, আসার পথে মাঝখানে এলাহাবাদে দুদিন ঘুরেছি।

—আমরা মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা, কানপুর, মোগলসরাই' ডালমিয়া নগর ঘুরে কাল রাত্রে ডেহ্‌রি-অন সোন থেকে গাড়ীতে চেপেছি। আগ্রা থেকেই আমাদের রিজার্ভেশন ছিল। আমরা আগেই চলে এসে টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলাম যে ডেহ্‌রি-অন সোন থেকে আমরা বার্থ 'অকুপাই' করব। আপনাকে আমি বৃন্দাবনে মেলার মধ্যে দেখেছি। কিন্তু সময় না থাকায় কথা বলতে পারিনি। আপনি হাওড়া যাবেন তো?

—হ্যাঁ। আপনারা?

—আমরাও। কোলকাতা কৈলাস বসু স্ট্রীটে আমাদের বাড়ী। আপনারা কোথায় থাকেন?

—ঝাড়ঘাটা, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট। আপনাদের আর দু'জন গেলেন কোথায়?

—ওঁরা ধানবাদে নেমে গেছেন।

—ওঁরা আপনার কে হন?

—একজন আমার বড়দা। আর একজন আমার দাদাই বলতে পারেন; আমাদের বাড়ীতে উনি থাকেন। আমরা মাষ্টারমশাই বলি। আমার ভাইপোকে উনি পড়ান।

মেয়েটির মা কাঁপা গলায় বলে উঠলেন—ও আমার ছোট ছেলে।

মেয়েটি হেসে বলল—আমার ছোড়দা বছর পাঁচেক আগে মারা গেছেন। মা ছোট ছেলের শূন্যস্থান উনাকে দিয়ে পূরণ করতে চাইছেন।

গোপা আর থাকতে পারল না। বলে ফেলল—উনার পরিচয় কি? অর্থাৎ নাম, বাসস্থান এইসব আর কি……।

—উনার নাম গোকুল দত্ত। পূর্ববঙ্গের ছেলে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এদেশে আসেন। কল্যাণী শরনার্থী শিবির থেকে চাকরির চেষ্টায় আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন ; সেই থেকে আমাদের বাড়ীতেই আছেন।

—বর্তমানে উনার আর কে কে আছেন ?

উনার মা বাবাও নাকি যুদ্ধের সময় এদেশে এসেছিলেন ; কিন্তু তাঁদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। অথচ বাংলাদেশেও তাঁরা ফিরে যাননি।

গোপা আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহসী হ'ল না। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল—ধানবাদে উনারা নেমে গেলেন কেন ?

মেয়েটি জবাবে জানাল--ওখানে আমাদের পাথর কাটার ব্যবসা আছে। অনেক দিন বেহাত থাকার পর আবার আমাদের দখলে এসেছে। মাষ্টারমশাই এখন সেখানে থেকে ব্যাবসাটা দেখাশুনা করবেন। দাদা গেলেন সব বুঝিয়ে চিনিয়ে দিতে।

মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল—আপনাদের বাড়ী আড়ংঘাটায়, অর্থাৎ যেখানে যুগোল-কিশোরের মেলা হয় ?

গোপা উত্তরে জানাল--হ্যাঁ। আমাদের বাড়ী থেকে মাত্র সাত-আট মিনিটের পথ। আসুন না এবার, আর ক'দিন পরেই তো মেলা বসছে, আমিও বাড়ীতে আছি এখন·········

---বাড়ীতে আছেন বলতে—আপনি কি বাড়ীতে বরাবর থাকেন না ?

গোপাবলতে বাধ্য হয়—আমি নার্সের চাকুরি করি। তিনমাস ছুটি নিয়েছিলাম। দু'মাস কেটে গেল ; আর মাসখানেক বাড়ীতে আছি।

---আপনারা একসঙ্গে এত ছুটি পান ?

—সাধারনত: পাওয়া যায় না, আমি বিশেষভাবে ছুটি ভোগ করছি, একরকম জোর করে, চাকরির পরোয়া না করে।

হাওড়া নামার আগে ওরা উভয়ে উভয়ের ঠিকানা নিয়েছে। বীণা অনুরোধ করেছে গোপাকে তাদের বাড়ীতে যাবার জন্য। বীণার কথাবার্তায় গোপার ভালো লেগেছে, আন্তরীকতা অনুভব করছে। গোপা কথা দিয়েছে পরের বার কোলকাকতায় এলে সে বীণাদের বাড়ীতে যাবে।

বীণার বৌদির দাদা রণজিৎ বাবু টেলিগ্রাম পেয়ে স্টেশনে এসেছিলেন। অনুরোধ সত্বেও গোপা বীণাদের ট্যাক্সিতে যায় নি। আলাদা ট্যাক্সিতে ওরা শিয়ালদা এল। এগারোটা দশের কৃষ্ণনগর লোকাল তখনও ছাড়েনি।

কুলির মাথায় মালপত্তর নামিয়ে গুছিয়ে বসতে বসতে গাড়ী ছেড়ে দিল। গোপা হেলান দিয়ে বসে চোখ বন্ধ করে আছে। ভাবছে, গোকুল এখনও অকৃতদার যদিওবা জানা গেল তবু সংশয় দূর হচ্ছে কই? বীণা আর গোকুলের প্রকৃত সম্পর্ক না জানা পর্যন্ত তার মনের স্বস্তি কোথায়? আর এই কারণেই গোকুলের কথাটা সে মাকে জানাতে পারল না।

১৭

জৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি নাগাদ গোপা চিঠি পেল তার বদলির আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। নূতন কর্মস্থল পুরুলিয়া জেলায় ঝালদা সাব ডিভিসনের অন্তগর্ত মাহাতমারা হাসপাতালে। গৌরকাকা ও মা গৌরী নিষেধ করলেও গোপা চাকরিতে যোগদান করতে রওনা হল। তাকে আজ কলকাতায় গিয়ে স্বপ্নার কাছে থাকতে হবে। তারপর কাল সকালে ব্লাক ডায়মণ্ড গাড়ীতে ধানবাদ গিয়ে সেখান থেকে বাসে ঝালদা। তারপর আবার ঝালদা থেকে বাসে মাহাতোমারা যেতে হবে। স্বপ্না এখন শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে আছে। শিয়ালদা নেমে ট্যাক্সিতে গোপা শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে এল। স্বপ্না সে সময় অপারেশন থিয়েটারে ছিল। খবর পেয়েও আসতে তাকে মিনিট দশেক দেরি হ'ল, কারণ অপারেশন টেবিলে তখন রুগী ছিল। হাতের কাজ শেষ হতে সে ছুটে এসে তার স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় বান্ধবী গোপীকে জড়িয়ে ধরল। তারপর হোস্টেলে নিয়ে গিয়ে নিজের শয্যায় গোপার বিশ্রামের ব্যাবস্থা করেদিয়ে অপারেশন থিয়েটারে ফিরে গেল।

ভোর সাড়ে চারটের সময় এলার্ম বেজে উঠলে গোপার ঘুম ভেঙে গেল। গরম কাল বলে বাইরে বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। স্বপ্না ও উঠে পড়েছে। আলু সেদ্ধ ভাত স্টোভে চাপিয়ে দিয়েছে গোপা স্নান সেরে এসে কাপড় পরতে পরতে তার ভাত হয়ে গেছে। তার ভাত বাড়া দেখে গোপা অনুযোগ করে বলল—এত সকলে আর কাজ পেলিনা? আমি কিন্তু কিছু খেতে পারবনা।

স্বপ্না অনুরোধ করে পাগলামি করিসনা সারাদিন পথে থাকবি, খাওয়া জুটবে কিনা তার ঠিক নেই। যা পারিস দুটো মুখে দে, নইলে রাস্তায় কষ্ট পাবি।

স্বপনার আন্তরিকতা অনুভব করে গোপা কথা না বাড়িয়ে আলুসেদ্ধ ভাত মাখন দিয়ে মেখে নিয়ে কয়েক গ্রাস উদরস্থ করে উঠে পড়ে স্বপ্না ও তার সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে এসেছে। তাকে দাঁড় করিয়ে স্বপ্না ছুটে গিয়ে টিকিট কিনে

তারপর হোস্টেলে নিয়ে গিয়ে নিজের শয্যায় গোপার বিশ্রামের ব্যাবস্থা করে অপারেশন থিয়েটারে ফিরে গেল।

ভোর সাড়ে চারটের সময় এলার্ম বেজে উঠলে গোপার ঘুম ভেঙে গেল। গরম কাল বলে বাইরে বেশ ফর্সা হয়ে গেছে। স্বপ্নাও উঠে পড়েছে। আলু-সেদ্ধ ভাত স্টোভে চাপিয়ে দিয়েছে। গোপা স্নান সেরে এসে কাপড় পরতে পরতে তার ভাত হয়ে গেল। তার ভাত বাড়া দেখে গোপা অনুযোগ করে বলল—এত সকালে আর কাজ পেলি না? আমি কিন্তু কিছু খেতে পারব না

স্বপ্না অনুরোধ করে বলল—পাগলামি করিস না, সারাদিন পথে থাকবি খাওয়া জুটবে কিনা তার ঠিক নেই। যা পারিস দুটো মুখে দে, রাস্তায় কষ্ট হবে না।

স্বপ্নার আন্তরিকতা অনুভব করে গোপা আর কথা না বাড়িয়ে আলুসেদ্ধ ভাত মাখন দিয়ে মেখে নিয়ে কয়েক গ্রাস উদরস্থ করে উঠে পড়ল। স্বপ্নাও তার সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে এসেছে। তাকে দাঁড় করিয়ে সে ছুটে গিয়ে টিকিট কিনে আনল। স্বপ্না দোতলা বগির একটা খালি সীটে গোপাকে বসিয়ে দিয়ে নেমে যাওয়ার সময় বলল—পৌঁছে চিঠি দিস।

—আচ্ছা, তুই জবাব দিস কিন্তু। গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। দুই বান্ধবী হাত নেড়ে পরস্পরকে বিদায় জানায়।

ধানবাদ স্টেশনে নেমে রাঁচী গামী বাসে উঠে গোপা বিকাল বেলা ঝালদায় পৌঁছল। লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে মাহাতোমারা যাবার বাসের কাছে গিয়ে সে বেকুব বনল। এ বাসে তার পক্ষে ওঠা সম্ভব নয়। বাসের ভিতরে যেমন ঠাসা ভিড়, তেমনি ছাদেও তিল ধারনের জায়গা নেই। মাল-পত্র, ছাড়াও ছাদে স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মেয়ে-পুরুষে ভর্তি। আজ নাকি এখাকার হাট-বার তাই এমন ভিড়ের চাপ। এর পরের বাস রাত্রি সাড়ে সাতটায়। অর্থাৎ তিন ঘণ্টা পরে। এখান থেকে বারো-তেরো মাইল পথ হেঁটে কিংবা রিক্সায়ও যাওয়া সম্ভব নয়। গোপা চোখে সরষের ফুল দেখল। অনেকবার চেষ্টা করে সে বাসের ভিতরে যেতে বিফল হল। মনে পড়ছে মায়ের নিষেধের কথা। ভাবছে একবার হাত ধরে ঝুলে পড়বে কিনা। কিন্তু তা করা আর আত্মহত্যা করা একই ব্যাপার। মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে বাস ছেড়ে চলে যেতে গোপা পিছনের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এই অচেনা জায়গায় একাকী কত

রাত্রে হাসপাতালে পৌছুবে কে জানে! সে তার সাইডব্যাগ আর স্যুটকেস নিয়ে সামনে পেতে রাখা বেঞ্চিতে থপ বসে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে সে অনুভব করে বেশ খিদে পেয়েছে, কিছু খাওয়া দরকার। সামনে একটা খাবারের দোকান দেখতে পেয়ে সে মালপত্র সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দোকানের কাছে যেতেই দোকানী তাকে আহ্বান জানিয়ে ভিতরে বসার অনুরোধ করল।

গোপা ভিতরে গিয়ে বসে চারটে কুচুরি চাইল।

বৃদ্ধ দোকানী কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে বিশেষ আঞ্চলিক টানে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কুথা থিকে আসছো মা?

গোপা খেতে খেতে জবাব দিল—কোলকাতা থেকে।

—কুথায় যাবেক?

—মাহাতোমারা হাসপাতালে, কিন্তু বাসে উঠতে পারলাম না, আবার কখন বাস পাব বলুন তো?

—সেই সাড়ে সাতটায়, উধারে বাস বড় কম, তুমার রাত হয়েং যাবে।

গোপা খাবারের দাম মিটিয়ে আবার আগের বেঞ্চিতে এসে বসল। আকাশে মেঘ করেছে। এখনই হয়তো ঝড়-বৃষ্টি শুরু হতে পারে। গোপা ভয় পায়। শেষে যদি রাত্রে বাস বন্ধ থাকে তাহলে সে এই অজানা-অচেনা স্থানে কোথায় আশ্রয় খুঁজবে? এ পথে বোধ হয় তার পা বাড়ানোয় ভুল হয়েছে।

সে যখন আকাশ-পাতাল ভাবছে তখন একখানা লরি এসে তার সামনে দাঁড়াল। এক সুদর্শন যুবক মুখ বাড়িয়ে বলল—আপনিই মাহাতোমারা হাসপাতালে যাবেন বুঝি?

গোপা দ্বিধায় পড়ে গেল এই খালি গাড়ীতে একাকী এক যুবকের সঙ্গে তার যাওয়া ঠিক হবে কিনা।

যুবকটি গাড়ী থেকে নিচেয় নেমে এসে বলল—ওই মিষ্টির দোকানের মালিকের কাছে শুনলাম আপনি বাস ফেল করেছেন। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। এর পরের বাস যাবে কিনা তার ঠিক নেই। আপনি ড্রাইভারের পাশে বসুন. আমি পিছনে যাচ্ছি। আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি নির্ভয়ে উঠে বসুন। আমরা ওই পথেই যাচ্ছি. হাসপাতালে নামিয়ে দিয়ে যাব। বিপদ-আপদে আমাদের ওই হাসপাতালেই যেতে হয়; আপনাকে এটুকু সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য!

গোপা ভালো করে দেখে নিয়ে চিনতে পারে এ যুবক সেই গোকুল। তার পরনে খাকি পোষাক ও মুখে দাঁড়ি-গোফ অসম্ভব রকম বেড়ে ওঠায় গোপা প্রথমটা বুঝতে পারেনি। তারপর নিঃসংশয় হয়ে সে ড্রাইভারের পাশে এসে বসে গোকুলকে তার পাশে বসতে অনুরোধ করল। কিন্তু সংকীর্ণ জায়গায় না বসে গোকুল পিছনে চলে গেল।

গোকুল সাপ্তাহিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনার জন্য পাথর বহনকারী লরিতে ঝালদা এসেছিল।

ক্রোশ দুই চলার পর হাওয়া দিয়ে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির গতি বেগ বাড়তে কতক্ষণ? গোপার অনুরোধে বিহারী ড্রাইভার গাড়ী দাঁড় করালে নিজে দরজা খুলে রাস্তায় নেমে গিয়ে সে দেখল গোকুল জিনিসপত্র সহ চট মুড়ি দিয়ে বসে আছে। গোপা তাকে ডেকে বলল—ও মশাই আপনি দয়া করে নেমে আসুন। পরকে উপকার করতে গিয়ে নিজে জলে ভিজে অসুখ বাধালে আপনাকে দেখাশুনা করবে কে?

গোকুল বলল—আমি ভিজছি না, আর যদি ভিজে অসুখ করেই তবে আপনাদের হাসপাতাল আছে, আপনারা ......আমরা পুরুষ মানুষ; অত সহজে আমাদের শরীর খারাপ হয় না, আর দাঁড়িয়ে ভিজবেন না শীগ্‌গির গাড়ীতে গিয়ে উঠুন।

গোপা বুঝল গোকুল কথাটা সংশোধন করে নিল। সে মনে মনে হাসল। তারপর দৃঢ়তার সঙ্গে বলল—নাঃ আপনাকে ওখান থেকে নেমে সামনে আসতে হবে, নইলে আমিও এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজছি!

গোকুলকে বাধ্য হয়ে সামনে এসে বসতে হল।

গাড়ী চলছে। অনেকগুলো বছর পরে গোকুলকে কাছে পেয়ে এবং মাঝে মাঝে গাড়ীর ঝাকুনিতে ছোঁয়া পেয়ে গোপার শরীর ও মন প্রতি মুহূর্তে পুলক অনুভব করছে। সারা পথ দু'জনে অনেক গল্পই করল—তবুও গোকুল জানতে পারল না—তার পাশে বসা মেয়েটিই তার হারিয়ে যাওয়া প্রিয়তমা গোপা। আর গোপা কাছে পেয়েও ধরা দিতে পারছেনা। ভাবছে আগে গোকুল আর বীণার সম্পর্ক জানতে হবে। তাই নিজের নাম সে গোপার পরিবর্তে গীতা বলেছে।

সন্ধ্যার কিছু আগে গোপা হাসপাতালের গেটে নামল। লরি দূরের

পাহাড়ের দিকে চলে গেল। সে সেইদিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার শশধর মিশ্র ও নার্স দীপালি গড়াই তাকে সাদরে গ্রহণ করল। দীপালির স্বামী প্রফুল্ল চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারী। তারা স্বামী-স্ত্রী ও একটি এক বছরের শিশুকন্যা নিয়ে হাসপাতালের কোয়ার্টারেই বাস করে। সে রাত্রে তাদের ঘরেই গোপাকে খেতে হল; কারণ তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে রান্নার কোন ব্যাবস্থা নেই। আগে যে ছিল, যাবার সময় উনুনটাও ভেঙে দিয়ে গেছে।

পরেরদিন কোকিলের ডাকে গোপার ঘুম ভাঙল। ভোরে উঠে তার খুব ভালো লাগছে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। সূর্য্য তখনও ওঠেনি। পুবের আকাশ ক্রমশঃ লাল আভায় চিত্রিত হচ্ছে। সূর্য্য ওঠার প্রস্তুতি চলছে। যেদিকে চোখ যায় শুধু পাহাড আর শাল পিয়াল মহুয়ায় বন। বেলা আটটায় সময় মিশ্রবাবু ডেকে পাঠালেন। গোপা নিজের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে ঘরে ফিরে এল। কাল কোন রকমে রাত কাটিয়েছে। আজ তাকে বাসযোগ্য করে তুলতে হবে, রান্নার যোগাড় করতে হবে, ঘর-দোর গোছাতে হবে। এই সকল কাজের জন্য আজ সে ছুটি পেয়েছে। সে দীপালির বরের কাছে গিয়ে একটা ফর্দ হাতে দিয়ে বলল—দাদা, বাজার থেকে আমার এই জিনিস-গুলো এনে দিন।

প্রফুল্ল ফর্দের উপর চোখ বুলিয়ে বলল—উনুন-টুনুনতো এখানে পাওয়া যাবেনা, এখানে বাজার নেই। তরিতরকারী কিছু পাওয়া যাবে—বঁটি, উনুন, থালা-বাটি মাদুর এসব কিনতে হলে হয় ঝালদা—না হয় তুলিনে যেতে হবে। দু' একদিন অপেক্ষা করুন. একে একে সব ব্যাবস্থা হয়ে যাবে।

গোপা হেসে বলল—এ ক'দিন তাহলে খাব কি?

—খাবেন ভাত, রুটি, ডাল—আমরা যা খাই।

গোপা বলল—আপনার বৌ কষ্ট করে রাঁধবে আর আমি বিনা খরচে, বিনা আয়াসে বসে বসে খাব, বেশ মজা তো!

প্রফুল্ল বলল—আরে আপনি অত পর পর ভাবছেন কেন? বরাবর কেউ আপনাকে খাওয়াবেনা। দুটো একটা দিন অতিথি হয়ে কাটান না! তবে হ্যাঁ, আমার বৌ এর রান্না ভালো না লাগলে আপনিই না হয় রেঁধে খাওয়াবেন, তাতে আমাদেরও মুখ পাল্টাবে।

এরপর আর কথা চলেনা। গোপা টিউবওয়েল থেকে জল তুলে বাথরুমে গিয়ে স্নান সেরে এল। দীপালির রান্নাঘরে ঢুকতে গিয়ে তার এক তাড়া খেয়ে গোপাকে রণে ভঙ্গ দিতে হ'ল। এরা যে সহজে এমন আপন হয়ে উঠবে গোপা তা ভাবতে পারেনি। দীপালির মেয়ে এখন ঘুমুচ্ছে, অতএব কিছু করার না থাকায় সে ঘরে এসে মাকে ও স্বপ্নাকে চিঠি লিখতে বসল। প্রাকৃতিক ও আনুসঙ্গিক বর্ণনায় লিপিকা অনবদ্য কাব্যময় রচনা হয়ে উঠল।

বিকালবেলা দীপালি, গোপা, কমপাউণ্ডার রাখাল বাবুর মেয়ে আর প্রফুল্ল বারান্দায় বসে গোপার মায়ের দেওয়া কুলের আচার খেতে খেতে গল্প করছে এমন সময় একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের আদিবাসী মেয়ে এসে উঠানের মাটিতে বসে পড়ল। তার পড়নে দড়িভরা জীর্ণ ইজের প্যান্ট, গায়ে ছেঁড়া ব্লাউজ; এক মাথা তেলহীন নোংরা লালচে চুল।

প্রফুল্ল বলে উঠল—কি মানিক খবর পেয়ে গেছ? তারপর গোপাকে দেখিয়ে বলল—এই তোমার নতুন মনিব, কি খুশি তো?

গোপা তার দিকে তাকিয়ে বলল—ও কে?

প্রফুল্ল দূরের দিকে দেখিয়ে বলল—ও ওই গ্রামের মেয়ে। আগে যিনি ছিলেন তাঁর কাছে ও কাজ করত। বেলাদি যাবার সময় তাঁর সঙ্গে তাঁর দেশে যাবার জন্য সে কি কান্না ওর! সেই থেকেই প্রায়ই এসে খবর নেয় কেউ এল কিনা। আসলে ওদের খুব অভাব। দুটো খাওয়া-পড়ার জন্য অমন করে।

গোপা মেয়েটিকে বারান্দায় বসতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল--তোর নাম কি রে?

—মেয়েটি মুখ নিচু করে উত্তর দিল—ঝুমুর মাণ্ডি।

—লেখাপড়া জানিস?

—না; সিথায় পাঠশালা আছে নাই গো।

—তুই কি আমার কাছে কাজ করবি?

—রাখলে করব নাই ক্যানে গো?

—মাসে ক'টাকা মাইনে নিবি?

—যা মন লয় দিবেক, না লয় দিবেক নাই, কিন্তুক পেট ভরে খেতে দিবেক; যত খুশি খাটাই লিবেক।

গোপা এই সময় উঠে গিয়ে একবাটি চিঁড়ে আর খানকতক বাতাসা এনে ঝুমুরকে খেতে দিল।

ঝুমুর তার কোমরে জড়ানো এক টুকরো ময়লা কাপড়ে চিঁড়েগুলো চালতে গেলে গোপা বলল—তুই বাটিতে জলদিয়ে মেখে নিয়ে ভালো করে খা। কিন্তু ঝুমুর তার কথা না শুনে মুঠো করে চিঁড়ে-বাতাসা মুখে পুরে চিবুতে লাগল। চিঁড়েগুলো শেষ হলে সে কল টিপে অনেকক্ষণ ধরে জল খেল। তার অবস্থা দেখে গোপার ভারী মায়া হ'ল। যদিও গোপার একার জন্য কোন কাজের লোক দরকার ছিল না—কিন্তু মেয়েটিকে নিরাশ করতে তার বিবেকে বাধল। তাই ঝুমুর ফিরে এসে দাওয়ায় বসলে গোপা বলল—আজ তুই বাড়ী যা, পরশু থেকে কাজে আসিস।

ঝুমুর খুশি হয়ে হাসি মুখে মেঝেতে মাথা নামিয়ে গোপাকে নমস্কার করে আস্তে আস্তে বাড়ীর পথে হাঁটা দিল।

১৮

এখানে লোকবসতি খুব কম। কয়েক মাইল ছাড়া ছাড়া ছোট ছোট যে গ্রামগুলো রয়েছে তার অধিকাংশ আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত। এদের কারো কারো অবস্থা কিছুটা স্বচ্ছল হলেও বেশির ভাগ পরিবারের নূন্যতম প্রয়োজন আহার, পরিধেয় ও বাসস্থানের বড়ই অভাব। যথেষ্ট ভূমি থাকলেও তা উঁচু নিচু পাথরময়। চাষের জমি খুবই অল্প। ঠিকা মজুরিতে পাহাড়ের পাথর কাটা, জঙ্গলের কাঠ কেটে তুলিন মুরি প্রভৃতি জায়গায় নিয়ে বিক্রী করা ও গরু-ছাগল মুরগি পালন এখনকার উপজীবিকা। ঝালদা তুলিন রাঁচী ইত্যাদি শহরে গিয়ে মাটি কাটা, রাস্তা মেরামত বা দূরে অবস্থাপন্ন মানুষের বাড়ীতে কায়িক শ্রম দিয়েও অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে। খুব অল্প পরিবারের মধ্যেই লেখাপড়ার চল আছে। ইচ্ছা থাকলেও তা সহজ আয়ত্তের মধ্যে নেই। এদের প্রতি সদয় হয়ে সরকার হাসপাতাল করে দিয়েছে। যাতায়াত কষ্টকর বলে ডাক্তার বা নার্স এখানে বিশেষ আসতে চায় না। কিন্তু একবার কেউ এসে পড়লে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মায়া কাটিয়ে তাকে এখান থেকে ফিরে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যে গোপাও সেই সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে বাঁধা পড়ল। এখানে রুগী বেশি আসেনা। শহরের মত এখানে রুগীর আত্মীয়-স্বজনের উপদ্রবও নেই। সকাল আটটা থেকে দশ-এগারোটা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়। তখন আউটডোর খোলা থাকে। তবে সে ব্যস্ততা কোলকাত

বা শহরগুলির কোন হাসপাতালের মত নয়। অন্য সময়ের ডিউটিতে শুধু হাজির থাকলেই হল। কাজ কোনদিন পড়ে, কোনদিন পড়ে না।

ঝুমুর এখন সর্বক্ষণ এখানেই থাকে। গোপা তাকে দু'খানা শাড়ী আর তিনটি ব্লাউজ কিনে দিয়েছে। তার মাথার চুলও কালো হতে শুরু করেছে। সে গোপাকে কোন কাজ করতে দেয় না। কয়েক মাসের মধ্যে সে অনেক রকম রান্না শিখে ফেলেছে। অবসর সময়ে গোপা তাকে লেখাপড়া শেখায়। বর্ণ পরিচয় শেষ করে এখন দ্বিতীয় ভাগ পড়া চলছে। ইংরাজী-বাংলায় নাম ঠিকানা লেখাও তার রপ্ত হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম ঝুমুরের পেট ভরাতে গিয়ে গোপাকে মাঝে মাঝে হয় উপোস—না হয় দ্বিতীয়বার ভাত রাঁধতে হয়েছে। এখন আর সে ভাব নেই। খেতে খেতে খিদের মাত্রা কমেছে। শরীরের অপুষ্টতা কমে এখন যৌবনের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সকল কাজের ফাঁকে গোপা চঞ্চল হয়ে থাকে। প্রতিদিনই আশা করে থাকে গোকুল হয়তো দেখা করতে আসবে। কিন্তু সে আসে না। গোপা ডিউটিতে থাকাকালীন দুদিন লরিতে গোকুলকে যেতে দেখেছে। নিজে ব্যস্ত থাকায় তাকে ডাকতে পারে নি। সেদিন আউটডোরের কাজ শেষ করে ঘরে এসে সবে শাড়ীতে লাগানো ব্যাজটা খুলতে যাচ্ছে এমন সময় একটি ছেলে এসে খবর দিল—ডাক্তার বাবু শীগগির ডাকছেন।

গোপা ছুটে গিয়ে দেখল গোকুল ও অন্য একজন লোক একজন আহত শ্রমিককে ধরাধরি করে এর্জেন্সিতে নিয়ে আসছে। লোকটি নিচু হয়ে যখন কাজ করছিল তখন পাহাড়ের উপর থেকে একটা পাথরের টুকরো গড়িয়ে এসে তার পিঠে পড়েছে। হাড় ভেঙ্গেছে কিনা বোঝা যাচ্ছেনা। লোকটি যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সার্জিক্যালের ডাক্তার বিনয় বাবু এসে পড়লেন। তিনি পরীক্ষা করে ওষুধ ও ইঞ্জেকশন দিয়ে চলে গেলেন। পেশেন্টকে ইন্‌ডোরে ভর্তি করেনেওয়া হল।

কাজ মিটিয়ে চলে যাওয়ার সময় গোপা গোকুলকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল—কোথায় যাচ্ছেন? এদিকে আসুন, কোথায় কেমন ভাবে আছি দেখে যাবেন না? সেই যে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন আর একবার খোঁজও নিলেন না। সেদিন কিন্তু আপনাকে কর্তব্য সম্পর্কে এমন উদাসীন মনে হয় নি···।

গোকুল হাত জোড় করে বলল—ক্ষমা করবেন, কাজটা ভুল হয়ে গেছে,

আমি লজ্জিত। আসলে আমি ভাবতে পরিনি এখানে আপনি কষ্টে থাকবেন। আচ্ছা আজ দেখেই যাই কেমন আছেন। গোকুল নার্স গীতার সঙ্গে এগিয়ে চলে।

গীতা রূপী গোপা মাদুর পেতে গোকুলকে বসতে দিয়ে তাড়াতাড়ি বাক্স থেকে নতুন সাবান-তোয়ালে বের করে এনে পাশে রেখে বলল—ওই ঘরে গিয়ে স্নান করে আসুন, জল তোলা আছে; যা তো ঝুমুর সব দেখিয়ে দিয়ে আয়।

গোকুল অবাক হয়ে বলল—এ সব আপনি কি বলছেন?

—যা বলাছি তাই করুন। আপনি আমার অতিথি? এই দুপুরবেলা আপনাকে অভুক্ত ছেড়ে দিয়ে আমি আরাম করে খেতে পারব না। সে দিন আপনি যে উপকার করেছেন—জীবনে তা ভুলবার নয়… ।

গোকুল বলল—আমি নিজের দরকারে এসে আপনাকে বেশ মুস্কিলে ফেললাম তো? আগে জানলে…

—আঃ কেন কথা বাড়াচ্ছেন বলুন তো? আমাকে দুঃখ দিয়ে আপনার লাভ হবে কিছু? যান তাড়াতাড়ি স্নান করে আসুন, আমি ড্রাইভারকে খবর দিয়েছি সে যেন লরি নিয়ে চলে যায়।

গোকুল গীতার ধমক খেয়ে বাথরুমের দিকে গেল।

খাবারের বিশেষ আয়োজন নেই। আলু-পোস্ত, ডাল আর দুধ। ঝুমুর এরই মধ্যে কোথা থেকে পাকা কলা যোগাড় করে এনেছে। গোকুল তৃপ্তি করে খেতে খেতে বলল—এমন যত্ন করলে কিন্তু আপনি মুস্কিলে পড়বেন, মাঝে মাঝেই তাহলে উপদ্রব সইতে হবে।

—তা যদি হয় তো সে আমার পরম সৌভাগ্য, আমি অতিথি ভালোবাসি। কথাটা বলে গীতা মাথা নিচু করে রইল।

গোকুল এ কথার কোন জবাব দিতে পারল না, চুপ করে রইল। সে ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম নিয়ে একবার খোঁজ করে জানল আহত লোকটি ঘুমুচ্ছে। গীতা তখনও খায়নি। ভাবল সে থাকাতে গীতার আহার ও বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটছে। তাই কাজের অজুহাতে সে বিদায় নিয়ে একখানা চলন্ত লরি ধরে কার্য্যস্থলে চলে গেল!

যে কয়দিন লোকটি হাসপাতালে ছিল—প্রায় প্রত্যেকদিন গোকুল হাসপাতালে এসেছে। গীতা রূপী গোপার কোয়ার্টারে গিয়ে গল্প করে চা-

জলখাবার খেয়ে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে গেছে। এক এক সময় গোপার মনে হয়েছে গোকুলকে তার সত্য পরিচয় দিয়ে সকল কথা খোলাখুলি আলোচনা করবে। কিন্তু বীণার কথা মনে হতেই সে চোখে অন্ধকার দেখে। তখন তার মনে হয় এই ভাবে অভিনয় করে যতদিন চলে চলুক।

বর্ষাকাল শেষ হয়ে শরৎকাল এসে গেল। আগামী পনের-ষোল দিন পরে দুর্গা পূজা। এখান থেকে বোঝার উপায় নেই যে এই পশ্চিমবঙ্গেরই অন্য প্রান্তে গোপাদের অঞ্চলে কত সমারহের উদ্দীপনায় পূজার প্রস্তুতি পর্ব চলছে। এবার আর তার বাড়ী যাবার কোন উৎসাহ নেই। তার পাওনা ছুটিও হাতে নেই। এখন এই হাসপাতাল ছেড়ে তার কোথাও যাবার ইচ্ছা জাগে না। প্রতিদিনই তার আশা-দুরাশার মধ্যে সময় কাটে। সে মনে মনে প্রস্তুত হয় এবার যেদিন গোকুল আসবে তাকে সে অনুরোধ করবে পূজার সময় অন্ততঃ একটা দিনের জন্য হলেও যেন কোথাও বেড়াতে নিয়ে যায়। তাতে সে যা মনে করে করুক—আর এতে তার অবশ্যই অধিকার আছে; শুধু বীণার জন্যই সে নিজেকে এমন বঞ্চিত রাখতে বাধ্য হয়েছে।

যেদিন গোপা জানালায় বসে গোধুলির আকাশে রঙের খেলা দেখতে দেখতে এসব কথা ভাবছিল, ঠিক তার পরের দিনই সে চরম আঘাত পেল। মায়ের চিঠি এসেছে। সেই খামে এসেছে বীণার হাতে লেখা বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র। সে লিখেছে—

প্রিয় বান্ধবী গোপা, আগামী চব্বিশে শ্রাবণ আমার বিয়ে। তোমাকে ভাই এক সপ্তাহ আগে আসতে হবে। না এলে বুঝব তুমি আমার বন্ধুত্ব মেনে নাওনি; আর ভবিষ্যতে তোমার বিয়েতে যাই সেটাও হয়তো তুমি চাওনা। দেখি তুমি সত্যি কী চাও?

ইতি—বীণাপানি মুখোপাধ্যায়।

কোথায় কার সাথে বীণার বিয়ে সে সব কিছু লেখা না থাকলেও গোপা নিজেকে সংযত রাখতে পারছে না। উষ্ণ অশ্রু চিবুক বেয়ে ব্লাউজের উপরিভাগ সিক্ত করছে। চব্বিশে শ্রাবণ অর্থাৎ একমাস দশদিন হয়ে গেল। চিঠিটা বাড়ী হয়ে অনেক দেরিতে এখানে পৌঁছেছে। তাহলে তার মানস-প্রতিম এখন বীণার অধিকারে? এর পরেও সে তারই জন্য পথ চেয়ে থাকে? সে নিজেকে কিছুতেই বোঝাতে পারছে না এখন তার কি নিয়ে দিন কাটবে?

এক একবার গোপার মনে হয় সে নিজেই তো এই ভুল করেছে! যেদিন সে এখানে লরিতে পাশে বসে এল—সেইদিনই তো সব ব্যক্ত করে তার পুরানো ঘনিষ্ঠতার নব মূল্যায়নের চেষ্টা করতে পারত। নিজের সর্বনাশ তো সে নিজেই করেছে! সে শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নিল। সেদিন এক গেলাস জল ভিন্ন তার মুখে অন্য কিছু রুচল না।

পরেরদিন অনেক বেলা পর্যন্ত বিছানায় পড়ে থেকে গোপা সবে উঠি উঠি করছে এমন সময় ঝুমুর এসে খবর দিল—দিদি গোকুল দাদা হাসপাতালে এসেছে, মাথায় গায়ে রক্তে ভর্তি…

—কী বললি? গোপা তড়াং করে উঠে বসে কোন মতে বেশবাস ঠিক করে ছুটে এমার্জেন্সিতে এল। দেখল গোকুলকে স্ট্রেচারে শুইয়ে রাখা হয়েছে। দীপালী তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে। গোপা আর্তস্বরে জিজ্ঞাসা করল—দীপুদি ওর কী হয়েছে?

দীপালী বলল—পাথর ভাঙার সময় নাকি একটা ছোট্ট টুকরো ছুটে এসে মাথায় লেগেছে। পাথরের সরু কোণ গেঁথে গিয়ে এমন ব্লিডিং হচ্ছে। ও এখনই বন্ধ হয়ে যাবে, ভয়ের কোন কারণ নেই।

গোপা বলল—ডাক্তারবাবু ওকে ভর্তি করে নিন।

ডাক্তারবাবু বললেন—কোন প্রয়োজন ছিল না। ঠিক আছে তুমি যখন বলছ—তখন ভর্তি করেই নিচ্ছি।

গোকুল এই সময় চোখ খুলে বলে উঠল—না ডাক্তারবাবু আমাকে ছেড়ে দিন।

ডাক্তারবাবু হেসে জবাব দিলেন—আর তো ছাড়া যাবে না, ভর্তির হুকুম হয়ে গেছে যে!

পাঁচদিনের দিন ঘা সম্পূর্ণ সেরে গেলে গোকুলকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। এ কয়দিন গোপা কাছাকাছি থাকলেও ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি। অল্প ক্ষত হলেও শেষে মারাত্মক কিছু না হয় এই ভয়েই সে সেদিন ডাক্তারকে অনুরোধ করে গোকুলকে ভর্তি রেখেছিল। হাসপাতাল ছেড়ে যাবার দিন গোপা অনেক চেষ্টায় কৌতূহল চাপায় রেখে গোকুলকে বিদায় দিল। গোকুল গীতা রূপী নার্স গোপার অন্তরে প্রবহমান ঝড়ের দাপাদাপির কথা দুণাক্ষরেও জানতে পারল না। অথবা জেনেও মনে চাপা কৌতূহল নিয়ে ফিরে গেল।

১৯

কয়েকদিন পরে ঝুমুর বলল—দিদি, মা তোমাকে আমদের বাড়ীতে ডেকেছে।

—কেন রে ?

ঝুমুর কথার জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

তার ভাব দেখে গোপার হাসি পেল। সে বলল—কী ব্যাপার বল তো ?

ঝুমুর কোন মতে উচ্চারণ করল—আমার বিহা হবে গো, উয়ারা দেখতে আসবেক বটে।

গোপা বলল—তাই বল বিহা! তোর বিহা তো আমার কি ? নাঃ আমি যাবো-টাবো না…

—তোমাকে যেতেই হবেক, আমাকে সাজাই দিবেক; নাইতো উয়ারা পছন্দ করবেক ক্যানে গো ?

—বুঝলাম এতক্ষণে, তা তোর বর মানে সেই ছেলেটি কি করে ?

—শহুরে কুন চাকরি করে গো, মাসে মাসে ট্যাকা পায়; লিখাপড়া জানে…।

—তবে তো ভালোই। কবে যেতে হবে ?

—পরশু রবিবারে।

রবিবারে সকালে গোপা ঘুম থেকে উঠে অবাক হ'ল। ঝুমুর এরই মধ্যেই স্নান সেরে এসে রান্না চরিয়েছে। গোপা বলল—তুই এত সকালে এ সব করছিস কেন ?

ঝুমুর জবাব দিল—তুমি বুঝি সব ভুলে গেলে ? আমি আজ বাড়ী যাবক নাই ?

গোপা বলল—ভুলব কেন ? তুই তো সকালে উঠেই চলে যেতে পারতি ও সবের কোনই দরকার ছিল না…

—বারে তোমার কষ্ট হবেক নাই বুঝি ?

গোপা ঝুমুরের গাল টিপে বলে উঠল—ওরে দুষ্টু মেয়ে, তুই যখন থাকবি না তখন আমায় কে রান্না করে খাওয়াবে ? ওঠ্ শীগিগ্‌র কাপড় পাল্টে—বাড়ী যা।

আমি বেলার দিকে যাব। সে রান্নার বাকী দায়িত্ব নিয়ে ঝুমুরকে বাড়ী পাঠিয়ে দিল।

খানিকটা বেলার দিকে ঝুমুরের ভাই সোনাই গোপাকে নিতে এল। দুজন চান করে রান্না খাবারগুলো খেয়ে পথে বের হ'ল।
সুবর্ণরেখা নদী পার হয়ে কয়েক মাইল হেঁটে ঝুমুরদের গ্রামে যেতে হয়। গ্রাম ঠিক বলা যায়না। পাহাড়ের পাদদেশে শাল পিয়াল পলাশ মহুয়া গাছে ঘেরা জঙ্গলের মাঝে পাতার ছাউনি দিয়ে গড়া আস্তানায় এক একটি পরিবার বাস করে। কাটা বাঁশ, গাছ কিংবা ইঁটের বদলে সজীব গাছ এখানে খুঁটির কাজ করছে। মাত্র দু'তিনখানা বাড়ী গোপার চোখে পড়ল যা বড় বড় পাথর সাজিয়ে দেয়াল তৈরি করে তার উপর কাঠ ও ধানের বিচালী দিয়ে ঘর বানানো হয়েছে। গোপা মাথা নিচু করে ঝুমুরদের ঘরে ঢুকল। ঝুমুরের মা শাল-পাতায় বোনা আসনে তাকে বসতে দিল। ওই ঘরের এক কোণে তখনও রান্না চলছে। অতিথিরা এসে বুধাই সোরেনের বাড়ীতে আছে। তারই ভাগ্নে পাত্র। গোপা একটু বিশ্রম নিয়ে তার কাজে লেগে গেল। সঙ্গে আনা দামী শাড়ীখানা ঝুমুরকে যত্ন করে পরিয়ে দিল। মাথা আঁচরে, চুল বেঁধে, প্রসাধনে সাজিয়ে ঝুমুরকে রূপবতী করে তুলল। সব কাজ সমাধা হলে অতিথিদের খবর দেওয়া হল। তারা এসে আসন গ্রহণ করে নিজেদের ভাষায় ঝুমুরকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করল। ঝুমুর সেই ভাষাতেই জবাব দিল। গোপা তাদের কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারলনা। ছেলের বাবা ঝুমুরের জবাবে তুষ্ট হয়েছেন। ঝুমুরের হাতে পাচটা টাকা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। ঝুমুর হাঁটু মুড়ে বসে তাঁকে প্রণাম করল। ছেলেটির বয়স আঠারো উনিশ হবে। কালোর উপরে বেশ দেখতে। ছেলেটির বাবা গোপার সঙ্গে খাঁটি বাংলায় কথা বললেন। তাঁর কথায় জানাগেল ছেলে বংশী আসানসোলে একটি কারখানায় সবে মাস তিনেক হ'ল চাকরি পেয়েছে।

এরপর খাওয়া দাওয়ার পালা। একটা মুরগি মারা হয়েছে। গোপাকে মাংস-ভাত খাওয়ানোর জন্য ঝুমুরের মা অনেক সাধাসাধি করেছে। কিন্তু সে খায়নি, কারণ সে মাংস খাওয়ায় অভ্যস্ত নয়। অবশেষে দুধ-ভাত খেয়েছে। পাছে কিছু না খেলে ঝুমুরের মা বাবা দুঃখ পান।

বিকালবেলা ঝুমুরকে নিয়ে গোপা পথে বেরিয়েছে। সুবর্ণরেখার চরে এসে

তার গতি থেমে যায়। এই নদীর বালিতে নাকি একসময় সোনা-পাওয়া যেত। এখনও ভূতত্ত্ব বিভাগের লোকেরা মাঝে মধ্যে এসে বালি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালায়। সোনালী রঙের বালির চরে হেঁটে বেড়াতে গোপার দারুণ ভালো লাগছে। আগামী মাসে ঝুমুরের বিয়ে। এশুভ সংবাদে গোপাও খুশি হয়েছে। তার কাছে ঝুমুর লেখাপড়া না শিখলে এখানে বিয়ে ঠিক হত কিনা সন্দেহ। নদী চওড়া হলেও একপাশে ক্ষীণ জলের ধারা। বর্ষার কয়েকমাস বাদ দিলে সারা বছর শুকিয়ে থাকে। সেই সময় দূরের পুলে না গিয়ে গরুমোষের গাড়ী এমন কি তক্তা বা কাঠ বিছিয়ে ইঁট বোঝাই লরি পর্যন্ত পারাপার হয়। আবার যখন বৃষ্টি হয় তখন ছোটনাগপুর অঞ্চলের পাহাড়গুলো থেকে গড়িয়ে আসা জলে এই নদীই ভয়ংকর রূপ নেয়।

কিশোরী ঝুমুরের সঙ্গে গোপাও আজ এই মুহূর্তে দামাল কিশোরী হয়ে উঠেছে। বালুচরে সে ছুটাছুটি করছে। জলের কিনারে গিয়ে চক্‌চকে ভিজা বালি অঞ্জলি ভরে তুলে নিয়ে ঝুমুরকে সে বলল এই দ্যাখ কত সোনা পেয়েছি।

ঝুমুর খানিকটা সরে গিয়ে দুহাতে বালি তুলে নিয়ে বলল—ধুর তুমি কিচ্ছু পাওনি, এই দ্যাখো আমি কত সোনা পেয়েছি।

মাঝে মাঝে জলের মধ্যে ছোট মাছ দেখে তা ধরার জন্য লাফিয়ে জলের মধ্যে নেমে দু'জনে ছুটাছুটি করছে। কিন্তু তাদেরকে ধরা অত সহজ নয়। একে বারে হাতের মধ্যে এসেও কেমন করে পালিয়ে যাচ্ছে গোপা তা ভেবে পায়না।

এমনি ছেলেমানুষি করতে করতে তারা অনেকটা দূরে চলে এসেছে। এক সময় গোপার বিস্ময় জাগে। কান পেতে শোনে কাছেই কে যেন বাঁশি বাজাচ্ছে। সহসা সে বালিকা হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত সেই সুরকে অনুসরণ করে ঝুমুরকে পিছনে রেখে এগিয়ে যায়। দেখতে পায় কিছু দূরে নদীর পাড়ে বসে গোকুল একমনে বাঁশি বাজাচ্ছে। সহসা সে থমকে দাঁড়ায়। ফিরে আসার চেষ্টা করে কিন্তু পারেনা। পিছন থেকে ডাক আসে—গীতা দেবী আসুন, আমি গোকুল!

একি, সেই চৌদ্দ বছর আগে ঘোস পুকুরে ভয় পেয়ে ফিরে আসার সময়ের সেই পিছু ডাক! এখন সে কি করবে? সে নিজে গোপা না গীতা? সে উপায়

খুঁজে পায়, গোপা এ ডাকে সাড়া না দিতেও পারে, কিন্তু গীতা কেন সাড়া দেবে না? গীতার সঙ্গে তো গোকুলের কোন বিরোধ নেই সে ঘুরে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলে। ঝুমুর দূরে দাঁড়িয়ে থাকে।

গোকুল এগিয়ে এসে ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—এদিকে কোথায় এসেছিলেন?

—ওই ওদের বাড়ীতে। সে দূরে দাঁড়ানো ঝুমুরকে দেখিয়ে দেয়। তারপর প্রশ্ন করে আপনি কোথায় থাকেন?

গোকুল কিছুদূরে পাহাড়ের ঢালে তাঁবু দেখিয়ে বলল—ওই ওখানে তাঁবুতে।

গীতা বিস্ময়ে প্রকাশ করে—তাঁবুতে?

—হ্যাঁ তাছাড়া এখানে আর কোথায় থাকব? এখানে শহরবাসীদের মত ইমারত কোথায় পাব? এখানকার বাড়ী-ঘর তো দেখেই এলেন। দাদা অবশ্য ঝালদা অথবা তুলিনে থাকতে বলেছিলেন। দিন পনের-কুড়ি তুলিনের জগন্নাথ বাবুর বাড়ীতে বেশ যত্নেই ছিলামও কিন্তু; কাজের সুবিধার এখানে জন্য চলে আসতে হ'ল।

—এখানে থাকায় অপানার সুবিধা? কেমন করে?

গোকুল বলতে থাকে—প্রথমতঃ ছুটাছুটি কমেছে। দ্বিতীয়তঃ কাজের গতি বেড়েছে। লোকজনকে তদারকির সুবিধা হয়েছে। ওরা ফাঁকি দেবার তেমন অবকাশ পাচ্ছে না।

এখানে খাওয়া-দাওয়া করেন কি ভাবে?

আমি সপ্তাহে দুই-একদিন ঝালদা অথবা তুলিন থেকে চাল ডাল আটা তরি-তরকারী ইত্যাদি কিনে নিয়ে আসি। আমার কাজের লোকদের মধ্যে কেউ না কেউ পালা করে রান্না করে খাওয়ায়। যার যেদিন পালা পড়ে সে মনে মনে সেই দিনটিতে ছুটির আমেজ অনুভব করে, কারণ—পাথর ভাঙার মত কঠিন কাজ সেদিন তাকে করতে হয় না। তাই রান্না করার জন্য রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

—ওদের রান্না আপনার মুখে রোচে?

—উপায় কি বলুন? চলে তো যাচ্ছে!

গীতা দীর্ঘঃশ্বাস ছাড়ে। তারপর বলে—আপনার কি কাজ আর এতে আপনার স্বার্থই বা কী আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন?

—আপনি এ সব শুনতে চান? তাহলে এখানে ঘাসের উপর ভালো হয়ে বসুন, অবশ্য আপত্তি থাকলে···।

—নাঃ আপত্তির আর কি আছে? আমি বসছি, আপনিও বসুন। তারা উভয়ে কাছা-কাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল।

গোকুল বলে চলে—একটা নির্দিষ্ট অংকের টাকায় এই পাহাড়গুলো লীজ নেওয়া আছে। লীজের মেয়াদ পর্যন্ত সত্বাধিকারী পাথর কেটে বিক্রী করতে পারে! পাঁচ, দশ পনের এমন কি বিশ-পঁচিশ বছর পর্যন্ত কারো কারো লীজ নেওয়া আছে। কেউ সরাসরি লোকজন লাগিয়ে পাথর কেটে দূর-দূরান্তে চালান দিচ্ছে, কেউ আবার কণ্ট্রাক্ট দিয়ে কাজ করাচ্ছে। আমার মালিক কাজটা সম্পূর্ণ আমার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। আমি এখানের কয়েকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে চুক্তি করে নিয়েছি। পাইকারী রেটে তারা মাল কেনে। এদিকে চুক্তি মত একটা কোম্পানী পাথর কেটে লরি করে সেই সব ব্যবসায়ীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসে। আমার কাজ হ'ল মালের হিসাব রাখা ও টাকা পয়সা আদায় করা।

—এখানে তো তাঁবুতে থাকেন টাকা পয়সা কি করে রাখেন?

—এখানে টাকা পয়সা বেশি রাখার প্রয়োজন হয় না। আদায়পত্র করে ঝালদা ব্যাংকে রেখে আসি। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চেকের মাধ্যমে লেন দেন হয়।

গীতা বলল—এতে আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থ কী?

—দেখুন ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভাবার এখনও সময় আসেনি। যাঁদের আশ্রয়ে আছি, তাঁদের স্বার্থ দেখাই এখন আমার একমাত্র কর্তব্য।

—আপনি তো এখানে থাকেন আপনার স্ত্রী কোথায়?

—স্ত্রী? গোকুল হাসল। তারপর বলল—এখানে স্ত্রীকে কোথায় পাব বলুন?

গোকুলের হেঁয়ালীপূর্ণ কথাটা গীতা বুঝে উঠতে পারেনা। সে প্রশ্ন করে আপনি বিয়ে করেছেন তো?

—বিয়ে? ওহ্ হ্যাঁ করেছিলাম তবে সকলের মত নয়, আর তাই বোধ হয়......

—বোধ হয় কী বলুন। গীতা গোকুলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

গোকুল সুবর্ণরেখার দিকে তাকাল। তারপর বলল—সে অনেক কথা, আজ নয় অন্য একদিন সুযোগ হলে বলব। সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এল, এবার ওঠা যাক। চলুন আপনাদেরকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

—আপনি আবার ফিরে আসবেন কি করে? রাত্রি হয়ে যাবে যে!

—আমার জন্য ভাববেন না। এখানে রাতে চলা-ফেরা করা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, কোন ভয়ের কারণ নেই।

কিছুক্ষণ সুবর্ণরেখার ধার দিয়ে হেঁটে এক সময় তারা লোক চলাচলের রাস্তায় উঠে এল। আকাশে চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমার দেরি থাকলেও শরতের নির্মল আকাশে চাঁদের কিরণ বেশ উজ্জ্বল। সুবর্ণরেখার জল, বালুচর তো বটেই পাড়ে গাছপালার শাখায় পাতায় জোছনা মোহিনী মায়া বিস্তার করেছে। সে জোছনা গীতা রূপী গোপার মনকে নাড়া দিচ্ছে। পাশাপাশি চলতে গিয়ে এক একবার গোকুলের সঙ্গে তার হাত পা শরীরের কোন অংশের স্পর্শ লেগে মনে রোমাঞ্চের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। গোকুলের মুখের কথা শুনতে সে এমন বিভোর যে মাঝে মাঝে কথার জবাব দিতেও ভুলে যাচ্ছে।

ক্রমে রাস্তা শেষ হয়। সকলে হাসপাতালের কাছাকাছি পাকা রাস্তায় এসে পড়েছে। আর তখনই হঠাৎ গোকুল বিদায় নিয়ে চলে যেতে গোপা বাস্তবে ফেরে। সে এক রাশ নিঃসঙ্গতা নিয়ে ঘরে ঢোকে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করে। কিছুতেই তার চোখে ঘুম আসছে না। কতক্ষণে পরিষ্কার ভাবে সে জানতে পারবে বীণার সঙ্গে তার প্রিয়তম গোকুলের বিয়ে হয়নি। নিঃসঙ্গতার জ্বালা যে আর সে সইতে পারছেনা…।

২০

পরেরদিন গোপা আউটডোরের কাজ মিটিয়ে ফেরার সময় তার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। সে ঘরে ঢুকে বিছানার উপর ইউনিফর্ম খুলে রাখতে রাখতে গুনগুনিয়ে গান ধরল :—

জানিনা জানো কিনা তুমি
আজো ভালো বাসি গোপনে।
মনের মুকুরে হেরি তব ছবি
শয়নে স্বপনে॥
জীবনে তোমায় পেলামই যদি
জানিনা কেন হারাই নিরবধি;
আজো কেন করি হাহাকার
দিবা-নিশা যাপনে॥

আর কত কাল এমনি করে,
রহিবে তুমি দূরে দূরে সরে ,
একা একা চলি মরু পথে
রোদন-বিলাপনে ॥

এই সময় পিয়ন এসে একখানা রেজিষ্ট্রী খাম দিয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি খামখানা ছিঁড়ে ফেলল। বীণার চিঠি। সঙ্গে তাদের স্বামী-স্ত্রীর বিয়ের কয়েকখানা ফটো। মায়ের চিঠিতে গোপার ঠিকানা পেয়ে সে এই চিঠি লিখেছে।

"বন্ধু তুমি বিয়েতে না আসায় খুব রাগ করেছিলুম। কষ্টও হয়েছিল। পরে জানলুম তুমি চিঠি পাওনি—মাসীমার চিঠিতে জানতে না পারলে আমার রাগ যেত না। আমার বরকে নিয়ে শীগ্‌গিরই তোমার প্রকৃতির রাজ্যে "হনিমুন" করতে যাচ্ছি। চিনতে অসুবিধা না হয় তাই ফটোগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে রাখছি। আর একটা কথা—আমাদের মাস্টারমশাই অর্থাৎ গোকুল বাবু তোমাদের কাছাকাছি কোথাও থাকেন। যদি তার সন্ধান পাও তাঁকে একটা সুসংবাদ দিও—তিনি এম-এ সেকেণ্ড ক্লাস পেয়ে পাশ করেছেন। আমরা ইতিমধ্যে আগের ঠিকানায় চিঠি দিয়েছি, কিন্তু পেয়েছেন কিনা জানি না। এখান থেকে রওনা হবার আগের দিন টেলিগ্রাম করব। তোমার ওখানে পৌছানোর পথ-নির্দশ জানিয়ে তাড়াতাড়ি চিঠি দিও, কেমন ? শুভেচ্ছা ও আন্তরিক প্রীতি নিও।

ইতি বীণাপানি গঙ্গোপাধ্যায়।

গোপা ফটোগুলো হাতে নিয়ে বসে রইল। তার সকল ভাবনা চিন্তার বিষয় কতক্ষণে সে তার প্রিয়তমের সান্নিধ্য লাভ করবে। ছি ! ছি ! তার মন কত নীচ ! সন্দেহের বশে ভুল পরিচয় দিয়ে নিজেকে তো বটেই—তার মানস প্রতিমকেও এমন বঞ্চনার মরুভূমিতে সে এতদিন ফেলে রেখেছে ? এখন তাহলে উপায় ? গোপা মনে মনে বহুদূরের যুগোল-কিশোর বিগ্রহকে ও পূজারীকে স্মরণ করে আভূমি প্রণাম জানাল। তারপর স্নান আহার সমধা করে বিকালের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু বিকাল পর্যন্ত থাকার ধৈর্য্য নেই। সে বেরুনোর জন্য তৈরি হল। ঝুনুকে বলল—আমি বেরুচ্ছি, ফিরতে দেরি হতে পারে।

গতকাল সন্ধ্যায় যেখানে তারা বসেছিল। গোপা হাঁটতে হাঁটতে সেখানে উপস্থিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক'শ গজ দূরে গোকুলের তাঁবু। সেখানে মজুররা কাজ করছে। কি ভেবে গোপা সেখানে গেল না।

গোকুল অনেক বেলায় দিবাভোজন সমাধা করে তাঁবুর বাইরে গাছতলায় খাটিয়ার উপর বসে সাতদিনের বাসি খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলিয়ে একবার সুবর্ণরেখার দিকে তাকাতে গিয়ে দেখতে পেল এক নারী মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। ভালো করে দেখে বুঝতে পারল—নার্স গীতা। গোকুল বুঝতে পারছে গীতা ক্রমশঃ আন্তরিকতার সূত্রে তাকে আবদ্ধ করতে চাইছে। ওর ভুল ভাঙিয়ে দেওয়া দরকার যে গোকুল কারো নয়, কারোও হতে পারবে না। সে শুধু তার হারিয়ে যাওয়া গোপার প্রেমিক পুরুষ। গোকুল পায়জামার উপর তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবীটা চাপিয়ে মজুরদের সর্দারকে বলল—রতনলাল, আমি একটু ঘুরে আসছি, তুমি লক্ষ্য রেখ।

—ঠিক হ্যায় আইয়ে সাব, হাম সব সামাল লেঙ্গে।

গোকুল গীতার কাছে গিয়ে বলল—এই রোদ্দুরে এত কষ্ট করে এলেন ?

গীতা হেসে জবাব দিল সঙ্গে ছাতা রয়েছে, তেমন বেশি কষ্ট হয়নি ; আর গরজে পড়লে করতে হয় বই কি !

জবাব শুনে গোকুল একটু হাসল। তারপর বলল—গরজটা আপনার না আমার ?

গীতা প্রগলভ্ হয়ে বলল—আপনার হতে পারে---আমারও হতে পারে, ধরুন আমারই !

গোকুল অসহিষ্ণু হয়ে জবাব দিল---আমার কাছে আপনার কি গরজ থাকতে পারে তাতো বুঝতে পারছি না !

গীতা গোকুলের চোখে চোখ রেখে বলল---যদি বলি অপনাকে দেখা, আপনার উষ্ণ সন্নিধ্য পাওয়াই আমার গরজের হেতু ?

গোকুল লজ্জিত ও বিরক্ত হয়ে বলল—না, না ; ওসব কথা আমাকে বলবেন না, ওতে আমি কষ্ট পাই। আর এতে আপনারও বিশেষ কিছু লাভ আছে বলে মনে করি না।

গীতা হেসে জবাব দিল—ঠিক আছে লাভ না হয় লোকসানই হবে ভালো-বেসে আপনি আমাকে যা দেবেন—তাইই আমি বুকে তুলে নেব।

মনে মনে ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেও গোকুল স্বাভাবিক ভাবে বলল—দেখুন গীতা দেবী আপনার মনে কি আছে আমার জানা নেই, কিন্তু যদি আমাকে নিয়ে কোন কল্পনা করে থাকেন তা হলে আপনি ভুল করেছেন, আপনার মনের উদ্দেশ্য কখনোও সিদ্ধ হবে না।

গীতা হাসি মুখেই জবাব দিল—আমি যেচে এসেছি বলেই কি এমন ঝগড়া করবেন ? একটু বসতেও বলবেন না ?

গোকুল লজ্জিত হল। বলল—আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু এখানে রোদ্দুরের মধ্যে তো বসা যাবে না, বসতে হলে হয় আমার তাঁবুতে যেতে হবে, নয়তো নদীর ধার দিয়ে খানিকটা এগিয়ে জঙ্গলের দিকে যেতে হবে।

—তাঁবু নয়, অন্য যেখানে খুশি নিয়ে চলুন।

—কিন্তু !

—কিন্তু কি ? আমার লোকসান তো ? ঠিক আছে দেখব আমার লোকসান কেমন করে হয়। আপনার মত পুরুষের কম্ম নয় একা পেয়ে আমার কোন লোকসান বা ক্ষতি কিছু করা……

গোকুল জিভ্ কেটে বলল—ছি ! ছি ! ওসব কথা নয়, ও ছাড়া পবিত্র ভাবেও কোন সম্পর্ক গড়ে তুলতে কার্য্যত আমি এখন অপারগ। আর ভবিষ্যতে পারব কিনা তাও জানিনা। বিশ্বাস করুন গত চৌদ্দ বছর চোখে না দেখতে পেলেও একটা দিনের জন্যও তাকে ভুলতে পারিনি। আমার বিশ্বাস যেখানেই থাকুকনা কেন—সে আমাকেও ভুলে যেতে পারেনি।

গীতা চট্‌পট্ বলে উঠল—দেখুন তাড়াতাড়ি পা চালান আমি ছায়ায় না বসে পারছি না। আমি আরাম করে বসব, আপনাদের দুজনের প্রণয়-ইতিহাস শুনব, তারপর স্বেচ্ছায় চিরদিনের জন্য আপনাকে নিষ্কৃতি দিয়ে যাব।

দু'জনে চুপ করে হাঁটছে। মিনিট দশ বারো পরে তারা পাহাড় থেকে জল নামার একটা নালার ধারে এসে দাঁড়াল। নানা জাতের ছোট বড় গাছে এই জায়গাটা ছায়া ঘেরা। গোকুল কিছু শালপাতা বিছিয়ে কাছাকাছি দুটো জায়গা করে দু'জনে বসল।

গীতা রুমাল দিয়ে কপাল ও মুখের ঘাম মুছে বলল—এবার বলুন গতকাল যা আমাকে শোনাতে চেয়েছিলেন।

গোকুল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে বলল—হ্যাঁ বিয়ে বলতে যা

বোঝায় অর্থাৎ পুরুত ঠাকুরের মন্ত্রোচ্চারন, বাসরজাগা, ফুলশয্যা এ সকল সামাজিক অনুষ্ঠান কিছুই আমাদের হয়নি সত্য—তবু এখন বুঝি সে দিন সবার অলক্ষ্যে আমরা না বুঝে যা করেছিলাম তাতে এই সকল অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যই সাধিত হয়েছিল। কিন্তু তারপরই সে আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেল। এই চৌদ্দটা বছর। আমার কি করে যে কাটছে……

—চৌদ্দ বছর আপনি বৌকে হারিয়েছেন? বলেন কী? এখন আপনার বয়স কত?

—এবার উনতিরিশে পড়েছি।

—আপনার কি বাল্য বিবাহ হয়েছিল?

—না, আমি তখন বাল্য পেরিয়ে কৈশরে পা দিয়েছি।

—বাবাঃ ওই বয়সে আপনারা মনে মনে এত তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন?

—না, না, ওসব কিছু ভাববেন না। বিশ্বাস করুন আমাদের মধ্যে নোংরামী বলে কিছু ছিলনা। ভালোবাসারও কিছু তখন বুঝিনি। সে আমাকে দেবতা মনে করে পবিত্র ভালোবাসায় বেঁধে গেছে; আর তাইতো কিছুতেই ভুলতে পারছিনা। তাই আপনাকে ওই সব কথা বললিম। তারপর শুনুন—সে হারিয়ে যাওয়ার পর আমি কি কি করেছি।

—একটু খানি বসুন আমি আসছি। গীতা খানিকটা এগিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল একটা বকুলের চারা গাছ এখানে সকলের অলক্ষ্যে জন্ম নিয়ে বেড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলে মহুয়া পলাশের অভাব নেই সত্য কিন্তু বকুল গাছের সাক্ষাৎ এই প্রথম। আর এখন ফুলের সময় না হলেও পাতার উপর বেশ কিছু শুকনো ফুল ছড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে অল্প দু'চারটে টাটকা ফুলও রয়েছে। সে আরও দেখতে পেল একটা ঝোঁপের উপর স্বর্ণ লতা জড়িয়ে আছে। সে আঁচলে করে ফুল কুড়িয়ে ও স্বর্ণ লতা টেনে নিয়ে আবার আগের জায়গায় ফিরে এসে লতায় ফুল গাঁথতে গাঁথতে বলল—এবার বলুন শুনি।

গোকুল অবাক হয়ে একমনে গীতার মালা গাঁথা কিছুক্ষণ দেখল। তারপর প্রথম থেকে সব ঘটনা বলে যেতে লাগল।

প্রায় ঘণ্টা দুই কথা বলার শেষে গোকুল বিরতি দিতেই গীতা মালাটা এক পাশে নামিয়ে রেখে বলল—তারপর?

গোকুল উত্তরে বলল—তারপর আর জানিনা। যাকে পাবার জন্য এমন

পরের বাড়ীতে থেকে গেলাম, কাঁচরাপাড়া ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের কত জায়গায় ঘুরলাম, কিন্তু তাকে আর কোথাও খুঁজে পেলাম না।

—যদি তাকে আর না পান।

—যতদিন না পাই খুঁজব ; যদি একেবারেই না পাই বুঝব আমার ভাগ্য তাকে জয় করতে পারেনি।

গীতা বলল—ধরুন এমন তো হতে পারে সে আর বেঁচে নেই। কিংবা বেঁচে আছে, সুখে স্বামী-সন্তানদের নিয়ে ঘর-সংসার করছে, তাহলে আপনি কি করবেন ?

—দেখুন আমার বিশ্বাস সে মরে নি। কারণ জীবিত কারো খবর যতই চাপা থাকুক মৃত ব্যক্তির খবরটা যে করেই হোক তাড়াতাড়ি রটে যায়। আমি আজ অবধি তেমন কোন খবর শুনিনি। আর যদি জানতে পারি সে সুখে ঘর-সংসার করছে, তখন আমি ভেবে দেখব কি করা যায়।

গীতা হেসে বলল—তবে কি আমাকে আপনার আশায় অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করতে বলেন ?

গোকুল জবাব দিল—আমি তো তেমন কিছু বলিনি! আর আপনি তেমন আশা করে থাকবেনও না…

—সে কি হয় ? আমি যে আপনাকে দেখা অবধি ভালোবেসেছি, আপনাকে ছাড়া এ মন, এ দেহ-যৌবন অন্য কোন পুরুষকে যে স্পর্শ করতে দিতে পারব না, আমাকে আপনি ফিরিয়ে দেবেন না। বিশ্বাস করুন আমি…

গোকুল অসহিষ্ণু হয়ে বাধা দিয়ে বলে উঠল—না গীতা দেবী, আমাকে বৃথা অনুরোধ করবেন না। আপনি আমাকে ভুলে যান। আমি অন্য কারোও প্রতি অনুরক্ত হতে পারব না।

গীতা জবাব দিল—এ অপনি কি বলছেন, আপনাকে ভুলে যাব ? তাই কি সম্ভব ? মন প্রাণ দিয়ে কাউকে ভালোবাসলে তাকে কি ভোলা যায় ? আপনি কি গোপা দেবীকে ভুলতে পেরেছেন ? বিশ্বাস করো আমার এই দেহ-মন জীবন-যৌবন, সব কিছু মনে মনে তোমাকে সমর্পন করে অপেক্ষায় দিন গুনছি কখন তুমি আমাকে আপন করে কাছে ডেকে নেবে…আমাকে না হয় তুমি গোপা বলেই ডেকো, আমার বিশ্বাস গোপা যেখানেই থাকুক সে তোমার প্রতি অখুশি হবে না। গীতা গোকুলের একটা হাত চেপে ধরল।

গোকুল ঘৃণাভরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে উঠল—ছি! ছি! কি প্রবৃত্তি আপনার! এত কথা শোনার পরেও নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারলেন না? আর আপনি কোন ছুঁতোয় আমার সংস্পর্শে আসবেন না… মনে রাখবেন আমার গোপা আপনার থেকে অনেকগুণে………বাকীটা তার আর বলা হল না।

গীতা উঠে দাঁড়িয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে বলল—বেশ আমাকে যখন চান না—তখন আর কোন কথা নেই, আমি তাহলে চলি। তবে আমার কথা শুনলে আপনার গোপাকে ফিরে পেতেন…

—কী বললেন? আপনি গোপাকে চেনেন? তার খবর কিছু বলতে পারেন? গোকুল ছুটে গিয়ে গীতার পথ আগলে দাঁড়ল।

—হ্যাঁ আমি গোপার সকল খবর জানি। গীতা নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

গোকুল বলল—আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করে বলুন তো আপনি ঠিক জানেন!

গীতা নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে বলল—গা নয়, এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি তার সব খবব জানি। আরো জানি সে এখন কোথায় কি ভাবে আছে।

এক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু পায়ের উপর পড়তে গোকুল বিচলিত হয়ে গীতার হাত ধরে টেনে তুলল। তারপর আগের জায়গায় বসিয়ে অনুরোধ করল—গীতা দেবী আপনি শান্ত হয়ে সব কথা বলুন আমি শুনছি। আপনাকে এভাবে কষ্ট দেওয়ায় আমি খুবই দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করবেন।

গীতা চোখে মুখে রুমাল বুলিয়ে নিয়ে কিছুটা সংযত হয়ে সুবর্ণরেখার দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করল।

"গোপারা কয়েকমাস কাঁচরাপাড়া থাকারপর তাদের গ্রামের গৌর কুণ্ডুর পরামর্শে ও সাহায্যে আড়ংঘাটা গিয়ে বসবাস করতে থাকে। গোপা স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে কলেজে পড়ার সময় নানা জায়গা থেকে তার বিয়ের সম্বন্ধ আসতে থাকে। কিন্তু গোপা জীবনের প্রথম প্রহরে যাকে ভালো বেসেছিল, সেই গোকুল ছাড়া কাউকেই মনোনীত করতে পারে না। তাই বিয়ে না করে নার্সের চাকরিতে যোগদান করে। গত বাংলাদেশ পাকিস্থান যুদ্ধের সময় সে কল্যাণী শরনার্থীদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিযুক্ত ছিল। তার সামনেই একদিন রাত্রে তাদের গ্রামের আছিরদ্দি সেখের মৃত্যু হয়। এর দুদিন পরে সে জানতে

পারে আটনম্বর শিবিরে গোকুল ছিল। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করেও তাকে আর সে খুঁজে পায় না। এরপর গোপা বৃন্দাবন বেড়াতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় এক যুবককে দেখতে পায়। তার মন বলে হয়তো বা ওই যুবকই তার প্রিয়তম গোকুল হতে পারে। কিন্তু পরিচয়ের কোন সুযোগ হয়ে ওঠে না। তারপর দেশে ফিরে আসার সময় কালকা মেলে মধ্য রাত্রে গোপা দেখতে পায় পাশের বার্থে সেই যুবক ঘুমিয়ে আছে। সে বড় আশা করেছিল সকাল বেলা ট্রেনে বসে ওই যুবকের সঙ্গে তার পরিচয় হবে। কিন্তু তার সে আশা পূর্ণ হ'ল না। ভোর হবার আগেই যুবকটি ধানবাদ স্টেশনে নেমে গেছে। ট্রেনে আলাপ হ'ল বীণার সঙ্গে। তার কাছে গোপা পরিচয় পেয়ে জানতে পারে ওই যুবকই তার প্রিয়তম গোকুল। সে মনে মনে যেমনি খুশি হ'ল—তেমনি বীণা ও গোকুলের সম্পর্ক নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল। বীণার ব্যবহারে সে মুগ্ধ হয়েছিল। তাকে সে বন্ধুত্বে বরণ করে নিয়েছিল। অতএব বীণার মঙ্গল কামনা করে পুরোপুরি তাদের সম্পর্কে না জানা পর্যন্ত গোপা নিজেকে গোকুলের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রাখার সংকল্প করল। তাই এই হাসপাতালে আসার দিন সে গোকুলের কাছে নিজের মিথ্যেপরিচয় দিল। লরির মধ্যে পাশে বসা গোপাকে গোকুল চিনতে পারল না।"

কান্নায় গীতা রূপী গোপার বাকরোধ হ'ল। সে একটু থেমে রুমালে চোখের জল মুছে নিয়ে আবার বলল—সকলের কাছে গোপা হলেও সে গোকুলের কাছে আজও গীতা নামে পরিচিতা। গোপা ব্যাগ থেকে বীণার পাঠানো খামখানা বের করে গোকুলের কোলের উপর রেখে তার পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

গোকুল খামের উপর লেখা নাম ও ঠিকানা পড়ে নিয়ে নিচু হয়ে ওকে ধরে তুলে কাছে নিয়ে গভীর আবেগে বলে উঠল—তুমি-তুমিই আমার সেই গোপা?

গোপা হাত বাড়িয়ে বকুলের মালাটা তুলে নিয়ে গোকুলের গলায় পরিয়ে দিয়ে সজল চোখে বলে উঠল—না, আমি তোমার বিরহিনী রাধা। তোমাকে পাবার জন্যে এখানে পড়ে আছি। আমার সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা কর। সে প্রিয়তম গোকুলের বুকে মুখ লুকাল।

শেষ অপরাহ্নের রক্তিম সূর্য্য পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে মুখ টিপে হাসছে। গোপার দুই কানে তখন বেজে চলেছে বাঁশরির সুর আর নুপুরের ধ্বনি।